পিঁপড়ের পক্ষশঙ্গ

পিঁপড়ের পদশব্দ

কল্যাণ মজুমদার

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা-১৭

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৫

প্রকাশক : সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী / ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ / কলকাতা-১৭

মুদ্রক : গীতারাণী ঠাকুর
স্বেম্বুইন প্রিন্টার্স / ৫৫এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট / কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ : দেবব্রত রায়

অরুণা ও ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গীকার-সচেতন অনন্য আত্মীয়যুগলকে

ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রে

গ্যালারিতে এখন এমন উত্তাপ যাতে এক মুঠো ধান ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তেই খই হয়ে ফুটবে। প্রতিটি দর্শকের ছিলা-টান স্নায়ু এখন ইলাসটিসিটির শেষ প্রান্তিক বিন্দুতে। সামনে লণ্ডভণ্ড সবুজ মাঠে বাইশজোড়া পা খুনীর ছোরার মতন উদ্যত ও চঞ্চল। ষাট মিনিটের হাড্ডাহাড্ডির ফলাফল এখনো শূন্য। ব্যর্থতা শব্দটি জুন মাসের অবসন্ন বিকেলে সকলের শরীরেই ঘামে ভিজে লকলক করছে। সারামাঠ দুভাগে, একটি ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠ, উদগ্রীব। সময়ের পুঁজি প্রায় শেষ—আর মাত্র দশ মিনিট। এখন যে-কোন বিদেশী শক্তি সারা কলকাতা দখল করে ফেললেও এই ষাট-সত্তর হাজার লোক বিন্দু-মাত্রও ভ্রূক্ষেপ করবে না। নৃশংস চোখে ও মনে প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য, অন্যের রক্ত—মানে, বিপক্ষের গোলে সগর্ব প্রবেশ। গোলের বদলে রেপ শব্দটি এখানে কি বেশি মানাবে না? গোল তো ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হয়! প্রতিরোধ ভেঙ্গে গেলে।

এক ঘন্টা ধরে চেঁচিয়ে সুশান্তর গলা ব্যথা করছে। শুকনো খরখরে তৃষ্ণা ওর সারা শরীরে। চোখ লাল। স্নায়ু ক্রমশই নিস্তেজ। ধারালো উত্তেজনা ওর শিরা-ধমনী এবার ছিঁড়বে। ওর প্রিয় দলের স্টপার বিপক্ষের বিপদজনক স্ট্রাইকারকে ফাউল করতেই ও চেঁচিয়ে উঠল—হিট হিম। মার শালাকে—কিক হিম—কিক—

কিক-এর বদলে ও মনে মনে ইংরেজি অতি পরিচিত চার অক্ষরের শব্দটিই উচ্চারণ করছিলো। আজ যতবার চেঁচিয়েছে ঐ একটি অনুষঙ্গই প্রকাশ পেয়েছে নানা শব্দে। বারবার বলেছে ডু ইট — ডু ইট —। কিক হিম—

কিক হিম। যা কেবল বলা নয়, আসলে অন্তর্গত আর্তনাদ।

পরশু নিয়ে পর পর তিনবারও ব্যর্থ হয়েছে। অথচ সীমা বিন্দুমাত্রও বাধা দেয়নি। বরং প্রতীক্ষার থরথর চূড়ায় অপেক্ষমানা ছিল। সুশান্তই পারেনি। না-পারার বাহ্যত কোনো কারণ ছিল না। উন্মুখ আকাঙ্ক্ষার ডাকে শরীর ঠিকই ঋজু কুর্নিশ জানিয়েছিল। সীমাও ছিল না তার প্রথম অভিজ্ঞতা। তবু, আহ, পরপর তিনবার—তিনটি ভিন্ন দিনে ও গোল পায়নি। পরশু তো সারাক্ষণ নিজের মধ্যে জলপ্রপাতের গর্জন ছিল—মাস্ট ডু ইট, মাস্ট ডু ইট। পারেনি। ব্লাডি বাস্টার্ড—নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছে। এমন ব্যর্থতার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল না আগে। অন্তত এক ডজন সফলতার গৌরব তো ছিলই। তাহলে সীমার সঙ্গে—কেন?

ওর দলের স্ট্রাইকার বিপক্ষের গোলের সামনে। চুলের গোড়ায় গোড়ায় সুশান্ত খাণ্ডবদাহনের তীব্রতা অনুভব করে। ও চিৎকার করে—ডু ইট—ডু ইট—কিক্—কিক্—

সুধাময়ের দলের লিঙ্কম্যান ল্যাং খেয়ে পড়ে গেছে। সম্ভবত ঈষৎ আহত। সুধাময় গলা চিরে চেঁচালো, শুওরের বাচ্চাদের খাল খুলে নে—হারামজাদাদের হুড়কো দিয়ে দে, ওদের মুখে লাথি মার—মুখে—শিক্ষা দিয়ে দে—জন্মের শিক্ষা—

প্রতিহিংসাপরায়ণ বাক্যস্রাব সহজে থামে না। একদমে যতক্ষণ সম্ভব সুধাময় চেঁচাতে থাকে। ইতিমধ্যে বল সারামাঠ বার চারেক ঘুরে আবার মাঝমাঠে।

আঠারোটি ইন্টারভ্যু দেবার পর শেষ যে নিশ্চিত ডাকটি ধরেছিল, গতকালই তা বিনাশব্দে হাতের মুঠোয় গুঁড়িয়ে গেছে। বড়বাবুর ভাইপোর চাইতে ইউনিয়ন নেতার ভাগ্নে যে ঢের বেশি পয়মন্ত স্ট্রাইকার হিসাবে কদর পাবে, নেহাত বড়বাবু মেজকার প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধাভক্তি বশতই সুধাময় তা বুঝতে পারেনি। এমন ল্যাং খাবে ও দূরতম কল্পনাতেও ভাবেনি। যোগ্যতর সুধাময় চাকরিটি পাবেই—সবই ঠিক ছিল। কেবল নিয়োগপত্রের অপেক্ষা। সেটা পেয়েছে ইউনিয়ন নেতার ভাগ্নে অবিনাশ।

খাল খিঁচে নিতে হয় শালাদের! —কাদের? সুধাময় নিশ্চয় ঠিক জানে না। এই মাঠ থেকে বিবাদী বাগের নানারং বিদ্ধস্মতার সৌধগুলি দেখা যায় না। বাঁদিকে তাকালে মায়াময় সবুজে-ঢাকা টিলার আড়ালে ফোর্ট। এটা সুধাময় অবচেতনে জানে। সে কারণে বিনাদ্বিধায় নির্ভয়ে, সাড়ম্বর

চিৎকার করে—মার শালাদের চামড়া খুলে নে—লাথি মার—মুখে—মুখে মার—

থুথু বেশি দূর যায় না।

অবনীবাবু সুধাময়কে একটুকরো শসা দিয়ে বললেন, গলা শুকিয়ে ফেলেছিস ভিজিয়ে নে—

—থ্যাঙ্কু দাদু। তুমি মাইরি গুরু লোক।

বাষট্টি বছরেও অবনীবাবু নিয়মিত মাঠে আসেন। ডান বগলে ক্রাচটি জাপটে বলেন, ফর্টি-টু ইয়ার্স মাঠে আসছি। ময়দানের ঘাসগুলোও আমাকে চেনে। এখনকার ছেলেরা খেলবে কি, ওদের সেই থাই-ই নেই। থাই ছাড়া ফুটবল হয়! থাই ছিল—

এ-বয়সের মানুষের স্বভাব—স্মৃতিচারণা, পুরনো প্রিয় মানুষের শরীরে বর্ণসম্ভার চাপানো—বেমানান হলেও। অবনীবাবু বেছে বেছে তাদেরই নাম করেন যাদের নাকি দুর্ধর্ষ থাই ছিল। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রাই তাঁর বেশি প্রিয়। ওদেরই থাই জোরালো হয়। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে হারামজাদা, মন্টির সঙ্গে লাগতে গেছিস কেন—ওর থাইয়ের দাম লাখ টাকা—তুই মার কোলে গিয়ে দুধ খাগে যা—

তাঁর প্রিয় খেলোয়াড় মন্টিকে কেউ ট্রিপ করেছে বলেই এই উষ্মার। মন্টি সজোরে শট নিতে গিয়েও বিপক্ষ খেলোয়াড়ের ধাক্কায় পড়ে যেতেই অবনীবাবু ক্রুদ্ধ অস্থিরতায় অবিরাম চিৎকার করতে থাকেন। তাঁর ভাষা—শ-কার, ব-কার, ম-কারের জমাট খিচুড়ি—মুদ্রণের অযোগ্য।

তিনি নিজের না-থাকা উরুর উদ্দেশে হাত বাড়ান। সিক্সটিথ্রিতে তাঁর প্রসিদ্ধ উরু জমা রেখে এসেছেন হাসপাতালে। বাস-দুর্ঘটনা। কুঁচকির একটু নিচে থেকেই ডান উরু নেই। বাঁ উরুতেও জোড়াতালি। ক্রাচে ভর দিয়ে কোনোক্রমে মাঠে আসেন। নেশা। আঠার বছর তিনি উরুহীন। আঠার বছর তিনি কোন রমণীর তাজা উরু স্পর্শ করেননি। ফ্লুরোসেন্ট আলোর মতন বিভাময় উরু শেষবার দেখেছিলেন অ্যাকসিডেন্টের মাস খানেক আগে—ছোটমাসীর ননদ। আজ আঠার বছর নারীহীন জীবন—শুধু উরুর জন্ত।

অবনীবাবু চিৎকার করেন—মন্টি উঠে দাঁড়া, তোর শালা ঐ থাই, গু-খোরদের কষে ঝাড় লাগা—লাগা ঝাড়—ঝাড় শালাদের—

আচমকা উত্তেজনায় তাঁর প্রেসার বাড়ে ও তিনি কাঁপতে থাকেন। গলা থামে না।

—ওরে হাঁদারাম, ওখানে কাকে বাড়িয়েছিস! তোর বাপের ঠিকানা আছে নাকি ওখানে—

অসিত সরোষে চেঁচায়। খিস্তি করে। ফুটবল মাঠে না চেঁচিয়ে, খিস্তি না করে কথা বলার নিয়ম নেই।

ওর দলের রাইট উইঙ্গারের পাস ব্যর্থ হয়ে গেছে গোল লাইনের বাইরে। অসিত নিজের চুলে খামচি কাটে। আর তো বেশি সময় নেই। এখন যে গোল দেবে সেই জিতবে। কিন্তু না জিতলে তার দল লীগ পাবে না। এ ম্যাচ জিততেই হবে। আর মাত্র পাঁচ মিনিট। অসিতের ধৈর্য পিরামিডের শীর্ষে—যে-কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে।

তিনবছর আগে ক্ষমতাচ্যুত একদলের কর্মী ও। তিন বছর ধরে পার্টির দাদারা আশা দিয়ে আসছেন, এইবার হবে—আবার ক্ষমতা আসবে হাতে। সোজা পথে না হলেও বাঁকা পথে। অসিত ফিরে পাবে পাড়ার রাজত্ব। পুলিস ওর পোষা হবে। ক্ষমতা টাকা আনে। টাকায় ভোগ। জীবন নিয়ে পায়রা-ওড়ানো। যা অসিত করেছে, যা ও করতে জানে, যা করতে চায়। তিন বছর ধরে ক্লৈব্য নিষ্ক্রিয়তায় প্রায় বিবরবাসী হয়ে আছে। হাঁটুর বয়েসী ছোঁড়ারা ওর দিকে করুণা ও বিদ্রূপের চোখে তাকায়। ওর বুকের ভেতরে আগুন জ্বলে—যে আগুনে বাষ্প হয় কিন্তু আলো জ্বলে না। যত্নে তৈরি পেটোগুলো সব ড্যাম্প মেরে গেছে।

আ: শালা—খানকির বাচ্চা আবার ওপেন-নেট মিস করলো! —অসিত গর্জন করে—বাতাবি নেবু নিয়ে গোল প্র্যাকটিস কর—এই চান্স জীবনে পাবি না—! খেলতে নেমেছ না মাজাকি করছ বাঞ্চোৎ—

ওর হিরো স্ট্রাইকার আলেকজাণ্ডার বল পেয়েছে। সামনে শুধু মন্টি—মন্টিকে পেরুলেই ফাঁকা গোল। আলেকজাণ্ডার শরীর বেঁকিয়ে মন্টিকে কাটাবার চেষ্টা করে।

—ঢোক, ঢোক—ডান দিক দিয়ে ঢোক—অসিতের কথা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু আলেকজাণ্ডার ডান দিকে কাটাবার চেষ্টা করে শট নেয়। মন্টির ভারি উজ্জ্বল ঊরু মাঠের তিন ফুট ওপরে বিদ্যুতের মতন চমকায়। বল মাঝমাঠে।

অসিত—মার-ঝাড়-ঝাড় শালাকে—

অবনীবাবু—সাবাস—মন্টি লড়ে যা—লাখটাকার থাই তোর—লড়ে যা—

সত্যিই অসিত জানত না কখন ওর হাতে ইটের টুকরো উঠে এসেছে। ওর অজান্তেই ওটা ক্ষ্যাপা মিসাইলের মতন মন্টির দিকে উড়ে যায়।

খেলা শেষ হতে আর দু'তিন মিনিট বাকি। মন্টির লব থেকে বল পেয়ে শিবাজী ঠেলে দিয়েছে রশিদের দিকে। সামনে গোলরক্ষক একা। রশিদ যে কোনো কোণ থেকে অব্যর্থ শট নিতে পারে। এ গোল ও পাবেই।

নীহারেন্দু সমস্ত স্নায়ু মনোযোগ অনুভূতি দু'চোখের মণির সূক্ষ্ম বিন্দুতে জড়ো করে। এই গোল দেখার জন্যই এত কষ্ট করে আসা।

তিনঘন্টা আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েও সময়মত পৌঁছতে পারেনি। মাঝখানে ট্রেন বন্ধ। লোড শেডিং। কাছাকাছি বাসস্টপে গিয়ে বাস পায়নি। কোনোরকমে শ্যামবাজার এসে ট্যাক্সির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। কেউ যাবে না। ওর পকেটে টাকা। ট্যাক্সি খালি। বেলা দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। তবু ওদিকে খেলার মাঠে—কেউ যাবে না। পাঁচটা ট্যাক্সি ওকে প্রত্যাখ্যান করে। যে প্রত্যাখ্যানে স্পষ্টতই অপমানের ছোবল ছিল। নীহারেন্দু সাধারণত ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, নিজের ভেতরে গজরায়। গজরায়—কারণ তার আর কিছু করার নেই। এই মাঠ থেকে রাইটার্স বিল্ডিং চোখে পড়ে না। মায়াময় সবুজের অন্তরালে ফোর্ট। প্রাণটি হাতে নিয়ে হ্যাণ্ডেল-ঝুলে আসা, বানর-বংশীয় বলেই যা পারে। নীহারেন্দুর আজকের গরম মাথাও ঐ খবরটা জানে।

রশিদের পায়ে বল। সামনে গোল।

সুশান্ত—ডু ইট—ডু ইট—কিক কিক—

সুধাময়—ঝাড়-ঝাড় শালাকে—

অবনীবাবু—তোর থাই আছে—লড়ে যা—

অসিতের হাতে ক্রমাগত ইটের টুকরো উঠে আসছে। কোত্থেকে আসছে ও জানে না। ক্ষমতায় থাকার সময় যেমন জানত না কীভাবে কোথা থেকে টাকা আসত। জানত না, কিন্তু আসত। ঠিক তেমনি।

নীহারেন্দু সারাদিনের সকল ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও অপমানের বিনিময়ে একটি-মাত্র সাফল্যের জন্য উন্মুখ। ওর হৃদস্পন্দন স্তব্ধ।

মাঠের একাংশে বিপুল চিৎকার। অন্য অংশে শ্মশানের স্তব্ধতা। উৎকণ্ঠাময়।

রশিদের পা খুনীর ছুরির মতন উদ্যত।

কোনটা আগে ঘটলো রেফারির খেলা শেষের সংকেত বেজে ওঠা, না

রশিদের গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতন বলের ওপরে পড়ে যাওয়া, নাকি গোলকিপারের ঝাঁপিয়ে পড়ে বল আটকানো বুঝে উঠতে পারার আগেই সত্তর হাজার গলায় সেই চিৎকার ওঠে যাতে সুন্দরবনের সমস্ত বন্যপ্রাণীরা ভয়ে হিংসায় ক্রোধে ক্রূরতায় এবং নিছক জীবনের তাড়নায় সমস্ত গ্যালারি দখল করে ফেলে।

অসিতের হাত থেকে অবিরাম মিসাইল ছোটে। সুশান্ত সারা মাঠের চিৎকার শোনে—ডু ইট—ডু ইট—কিক-কিক! নীহারেন্দু নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলে। সুধাময় কাকে ঝাড়ে জানার আগেই হাত-পা ছোঁড়ে—ঝাড়-ঝাড়—

অবনীবাবু—থাই, থাই না থাকলে খেলা যায় না—বলে হারানো ক্লাচ খোঁজেন।

লালবাজারের টেলিফোন তখন হাসপাতালের নম্বর খোঁজায় ব্যস্ত। রাইটার্সের অলিন্দে কৌতুকের হাসি নেচে বেড়ায়। আশ্বস্ত ফোর্ট বিলিয়ার্ড ক্রমে সবুজে সবুজ হয়ে সাজে।

আগামীকাল খবরের কাগজে জানা যাবে এই অজাযুদ্ধের ফলাফল—দলিত অজমুণ্ডের সঠিক হিসাব।

বৃষ্টি, বজ্র ও সমুদ্র

সকাল

বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত—আবহ-বার্তার বয়ান নিখুঁত প্রমাণ করে দুদিন ধরে যা চলছে, তাকে বলা যায় প্রকৃতির পাগলামি বা উচ্ছৃঙ্খলতা। আকাশের ঝাঁঝরি-গলা নিরলস বারিপাতের সঙ্গে এমন বাতাস, যার বানানে 'স'-র বদলে 'শ' হওয়া উচিত। তাহলেই বাতাসের ক্ষিপ্ত ঝাঁকড়া রূপটা যথার্থ ফুটতো।

ঘরের মধ্যেও যে বজ্র-বৃষ্টি চলছে সে সম্পর্কে এমন কোনো মৌলিক চিন্তা দিব্যর মাথায় এলো না। যদিও তারও পরমায়ু এখনো পর্যন্ত, একটানা, দুদিন।

ঘরে বৃষ্টি, কোনো নারী-নয়নের অশ্রুপাত না, বৃষ্টিই। ছাদের শরীরে বহু ছিদ্র। ছিদ্রের প্রমাণ—শোবার ঘরে, খাবার জায়গায়, রান্নাঘরে নানা রকমের টিন, বালতি, বাটি প্রয়োজন-মাফিক ছড়ানো। রং ও সাইজের মতোই এলোমেলোভাবে। দিব্য জানে, রেন-পাইপ বুজে গিয়ে ছাদ এখন সরোবর। যিনি এসবের চিকিৎসা করাবেন বা উপযুক্ত ডাক্তার ধরে আনবেন, তিনি, বাড়িওলা, ভোটপ্রার্থী মন্ত্রী বা এম-পি-কেও হার মানাতে পারেন প্রতিশ্রুতির আনলিমিটেড সাপ্লাই দিয়ে। হার মানিয়ে যাচ্ছেনও গত কত মাস ধরে। যদিও, সত্যি কথা—দিব্যই হেরে যাচ্ছে বিনামূল্যের বিনীত হাসির কাছে।

—আজ যদি তুমি বাড়িওলাকে ধরে না-আনছ কিংবা নিজে কোনো ব্যবস্থা না করছ, তবে আমি কালই এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। কথাটা যেন মনে থাকে। ছেলেমেয়ে নিয়ে এভাবে ভিজে আমি মরতে পারবো না।

বুঝেছ ?

এই হলো বজ্র। যখন পড়ে, হাটুরে কিলের মতোই অনর্গল পড়ে। দিব্য কিছুতেই বুঝতে পারে না কীভাবে এই বজ্র জট পাকিয়ে যায় এবং তিন বছর আগে শালীর ছেলের জন্মদিনে কার্ড পাঠাতে যে ভুলে গিয়েছিলো, সেই ইতিহাসও কী সাবলীলভাবে টেনে এনে, আক্ষরিকভাবেই, কানের ওপর পতন ঘটায়।

—নিজেও তো একটা লোক ডেকে আনতে পারো। কতক্ষণই বা লাগতো। কুঁড়ের বাদশা কোথাকার!

জুতোর ফিতে বাঁধতে মনোযোগী দিব্য আড়চোখে স্নুজয়ার দিকে একবার তাকালো। মনুষ্যকণ্ঠে লাগাবার মতো কোন সাইলেন্সর পাওয়া যায় না? কথাটা মনে হতে শুশুকের ভেসে-ওঠার মতো এক টুকরো হাসি ওর ঠোঁটে ভাসতে চাইলেও দিব্য তৎক্ষণাৎ তা মুছে ফেললো। এখন ওর মুখে হাসি ফুটলে হিরোসিমাও তুচ্ছ হয়ে যাবে।

—কবে থেকে বলছি, এ-বাড়িটা ছাড়ো। ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে কষ্ট। ব্যাঙে পেচ্ছাপ করলে রাস্তায় এক হাঁটু—

বজ্রপাতের মধ্যেই দিব্য হাতে ঘড়ি প'রে শার্টের বোতাম লাগাতে-লাগাতে স্ত্রীর, সুজয়ার, ব্রা-হীন ব্লাউজের ভূমিমুখী বুকের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, এখন ওকে "এসো, এসো, ওগো শ্যামছায়াঘন দিন" গাইতে বলবে নাকি! বললে সুজয়া কী করবে? এই কাঁসি-বাজানো গলাই ক'বছর আগেও চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গাইতো, ভাবা যায়! ঐ বুকে মুখ রাখলেই মনে হতো পৃথিবীর শিখরে পৌঁছে গেছি!

এখনকার, গত তিন বছরের এই সুজয়া, আর তার আগের ছ'বছরের সুজয়া, কোনটা আসল সুজয়া দিব্য বুঝে উঠতে পারেনি আজো। ন'বছরের বিবাহিত জীবন এতো ডেবিট ক্রেডিটে কন্টকিত, যে, প্রফেসনাল এ্যাকাউন্টেন্ট হয়েও দিব্য ব্যালেন্স শীট মেলাতে পারে না।

—অফিসে গিয়েই বাড়িওলাকে ফোন করবে। আজকেই—দিব্যর পিছনে বজ্রপাত গেট পর্যন্ত ধাওয়া করে। রাস্তায় নামতেই ঝামর বাতাস তাতার সৈন্যের মতো শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাতাটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকে রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় রবার্ট ব্রুস হতে হতে বাসস্টপে পৌঁছয়। মিনিবাসে বসে সিগারেট ধরাবার আগেই ঐ তাতার সৈন্য ওর মগজ দখল

করে ফেলে। সেটা অবশ্য দিব্য টের পায় অনেক দেরিতে।

ছোট নদী বা খালের মতো রাস্তা (এখনো কি একে রাস্তা বলা যায়?) বেয়ে মিনিবাস ষ্টীমলঞ্চের শব্দ তুলে ছোটে। দিব্যর মনে হয়, যেন ভেনিসে গণ্ডোলা চড়ছে। ও অবশ্য কখনো ভেনিসে যায়নি। ভাবলে, মনে হওয়াতে তো কোনো বাধা নেই। বৃষ্টি এখন সূক্ষ্ম হয়ে পড়ছে বলে জানালা খোলা। ভাতার সৈন্য অবিরাম ঝাঁপাঝাঁপি করে। আচমকা দিব্যর মনে পড়ে, ক'বছর আগে ডিউক-পিনাকী এরকমভাবেই না আন্দামানে পাড়ি দিয়েছিল! মিনিবাস ভেলার চেয়ে কি আর বেশি নিরাপদ। ওর চোখে একটা দুরন্ত সামুদ্রিক ছবি ভেসে ওঠে। ছবিটা দীর্ঘায়ু হতে পারে না। একটা মাল্টি-স্টোরিড বাড়ির ওপর থেকে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে বজ্রপাত হয়। সত্যিকারের বজ্রপাত।

তবু, আশ্চর্য, দিব্যর সুজয়ার কথা মনে পড়ে। অফিসে ইনভেস্টমেন্ট, ইন্টারেস্ট, পার্সেন্টেজ কষার ফাঁকে ফাঁকে, খুব মাথা খাটিয়ে, হিসেব কষে দেখেছে দিব্য, সুজয়ার এখন ওর, দিব্যর, প্রতি ইন্টারেস্ট—অনুরক্তির আনুগত্য বা সোজাকথায় মনোযোগ—টুয়েন্টি পার্সেন্ট। হ্যাঁ, ২০%। কিছু কম হলেও হতে পারে, বেশি কিছুতেই নয়। হিসেবটা আদৌ গোঁজামিল না। রীতিমত বৈজ্ঞানিক। একসময়ে, একেবারে শুরুতে, হাণ্ড্রেড পার্সেন্টই ছিলো। কীভাবে তা কমে কমে ২০%-এ এলো তার পুরো হিসেবই দিব্য দিতে পারে। অফিসে নিজস্ব ফাইলে ট্যাবুলেট করা আছে—

বিয়ের প্রথম দুবছর	—১০০%
ছেলে হওয়ার পর (৩য় বছরে)	—৭৫%
মেয়ে হওয়ার পর (৫ম বছরে)	—৫০%
ষষ্ঠ-সপ্তম বছরে	—৪০%
অষ্টম বছরে	—৩০%
নবম বছরে (চলছে)	—২০%

ছেলেমেয়ে হওয়া পর্যন্ত হিসেবটা বোঝা যায়। কিন্তু তারপরও ৩০% কমে কীভাবে ২০% হলো তার কোনো যথার্থ ব্যাখ্যা দিব্য প্রথমে অনেক ভেবেও বের করতে পারেনি। অথচ অনুভবে নির্ভুল ২০%। সুতরাং নিপাতনে সিদ্ধ হওয়ার মতো ওর সমীকরণ হয়, বাজার + গ্যাস + ধোপা + ছেলেমেয়ের স্কুল + ডাক্তার + ঝি + ইত্যাদি + এবং ইত্যাদি = ৩০%। ইত্যাদি,

এবং ইত্যাদি খুবই ইম্পর্টেন্ট।

আরো ছেলেমেয়ে হলে ভাগের ঐ ২০% থাকতো কিনা হলফ করে বলা যায় না। তবে ছেলেমেয়ে আরো না হওয়ার জন্য কোনো লাল ত্রিকোণের শাসন ছিলো না। সীজারিয়ানে দুটির বেশি হতে নেই, ব্যাপারটা এমনই বিজ্ঞানসম্মত। তাছাড়া ওর ঐ ২০%এর সঠিক ব্যাখ্যাও দিতে পারে দিব্য। টেন পার্সেন্ট ফর বীয়িং দ্য মানি-মেকিং মেসিন। প্রতি মাস পয়লায় এক ডজন বড়ো অশোকস্তম্ভের ছবি তো নির্বিকার সেলামি দেয়। দিব্য সেলামিই বলে। নিজে মাইনে পায় মাসের শেষে, কিন্তু সেলামি তো শুরুতেই গুনে দিতে হয়।

বাকি টেন পার্সেন্ট সুজয়ার বছরে স্বয়মাগতা হওয়া দশটি দিনের, রাতের বলাই ঠিক, জন্য। সোজা কথায়, ফর বীয়িং দ্য ফাকিং মেসিন। এখনো, দিব্য তো ঠিকই সুজয়ার যৌন-দাবী মিটিয়ে যাচ্ছে। দশটি দিন (বা রাত)—দিব্য রীতিমত স্ট্যাটিসটিকস্ নিয়ে বের করেছে—সারা বছরের ক্যালেণ্ডারে সুজয়া কীভাবে মার্ক করে রাখে আজো জানা গেল না। একটা দিনের পর আরেকটা দিনের মধ্যে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো এক একটা কল্লান্ত লুকিয়ে থাকে। কিন্তু, যখন আসে, সে-একটা রোমহর্ষক ব্যাপার। কোজাগরী পূর্ণিমার মতো সমারোহময়। একসঙ্গে এক লক্ষ রংমশাল জ্বলে। ভিভজোর-এর অর্থ বোঝাবার জন্যই সেদিন সূর্যোদয় ঘটে। সুজয়া জানেও। নিঃশেষে সমর্পিতা হতে এবং অতলান্তে ডুব দিয়ে দুর্লভতম মণি-মাণিক্য আহরণ করতেও। সেই মণি-মাণিক্যের স্ফুরিত আলোর আভরণে দিব্যকেও সম্রাটের অহংকারে ভূষিত করতে একটুও ভুল করে না। সেই সব স্বয়মাগতা দিনে সুজয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। সারা শরীর দিয়ে এডমাণ্ডো রসে-র 'আলমা ইয়ানেরা', ভেনুজুয়েলার হরোবো সংগীত, মূর্ত করে তোলে। ঐসব দিনে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও, দিব্যর মনে হয় ২০% এর হিসেবটা রিভাইজ করা উচিত। কিন্তু অন্যদিনগুলোতে, যখন দিব্য তার নিজস্ব দাবী আদায় করে? সুজয়া সব সময়ে বাধা দেয় না, আপত্তি করে না ঠিক। তবু দিব্য তো নির্ভুল টের পায়, সুজয়ার অনিচ্ছুক শরীর যেন তালপুকুর। শরীর না ডুবলে সাঁতার জমে কি? সুজয়ার শরীর থাকে ঠিকই, সুজয়া থাকে না।

একদিন, প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে, ঐ সময়ে অসফল খোঁড়া-খুঁড়ির পুরুষ-রাগে, সুজয়ার দুই স্তন শক্ত হাতে খাবলে ধরে, হৃৎপিণ্ডের ঢিপঢিপ শব্দের সঙ্গে

তাল মিলিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে দিব্য বলেছিলো, তুমি আমার—তুমি আমার—

সুজয়া ওর মাথার ক্রমশ-কমে-আসা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে, গলায় গিক্‌গিক্‌ শব্দ তুলে বলেছিলো, তুমি দেখছি রিমির মতো আরম্ভ করলে!

রিনি ওদের মেয়ে। সুজয়াকে কেউ ছুঁলেই খেতে-খেতেও, অন্ত ঘরে, দুহাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, মা আমার—আমার মা! রন্টু, ছেলে, অমনই করতো। এখন একটু বড় হয়েছে, আর অতটা করে না।

আসলে, দিব্য বলতে যাচ্ছিলো, তুমি যখন আমার সঙ্গে, আমার শরীরে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছো, তখন তুমি, শরীর-বিহীনা তুমি, কোথায় ছিলে? কোথায় যাও? যে-শরীর তুমি আমাকে দিচ্ছ, সে শরীরে তুমি থাকো না কেন?

সুজয়ার গলায় অস্ফুট গিক্‌গিক্‌ শব্দের পর এসব গভীর কথা আর বলা হয় না। তেতো মুখে দিব্যর তখন ইচ্ছে হয়েছিলো, সুজয়ার মুখের ওপর থুতু ছিটোতে। শরীরের সমস্ত সঞ্চিত গরল উজাড় করে ঢেলে দিতে।

মনে মনে কেবল বলেছিলো, জয়া, তুমি কখনো বুঝবে না, সব পুরুষের মধ্যেই একটি শিশু থাকে আমরণ। সে-শিশুর কখনো বয়স বাড়ে না। বাড়ে না বলেই পুরুষ জীবনকে সাজাবার স্বপ্ন দেখে, উদ্যোগী হয়। এককূল ছেড়ে অন্যপাড়ে পারাপার করে। একবার নয়, বারবার। শিশুটা থাকে বলেই জীবনটা আঘাটায় আটকে কুঁকড়ে যায় না।

এসব বলা হয় না সুজয়াকে। কেবল মনে হয়, ২০%এর হিসেবটাও কি ঠিক? আরো কি কমাতে হবে? ঐসব দিনে সন্দেহ দেখা দিলেও স্বয়মাগতা দিনগুলোর বৈভব বিবেচনা করে দিব্য হিসেবটা ২০% এই স্থির রেখেছে।

মিনিবাস থেকে নেবে দিব্যর মনে হলো, যেন ডিউক পিনাকীর মতো, সমুদ্র পেরিয়ে, আন্দামানের ভূমিতে পদার্পণ করলো। কানের মধ্যে তখনো তাতার সৈন্যের দুরন্ত টহল। চোখে সামুদ্রিক ছবি।

এইসব নিয়ে অফিসের দিকে যেতে-যেতে বুকের মধ্যে টিপচুপ শব্দের লহরী দ্রুত হতে থাকে। তিন মাস আগে যে ইন্টারভিউ দিয়েছিলো তার খবর আজই পাওয়ার কথা।

শিশুর স্বপ্নের পরী, কী আছে তার আঁচলে?

দুপুর

তুমি, দিব্য, এই বিরাট অফিসের তিন নম্বর এ্যাকাউন্টেন্ট। তারও-

বর্ষের ফাইভ পার্সেন্ট প্রিভিলেজড পিপলের একজন। ফাইভ নয়? সতেরশ টাকা গ্রস মান্থলি ইনকাম এদেশে ক'জন মানুষের? তুমি যে প্রমোশনের বিস্কুট রেসে নাম লিখিয়েছ, যদি বিস্কুটটা ঠিক মতো কামড়ে, বিশ্বস্ত কুকুরের মতো ছুটে থাকো, তাহলে এই ছোট ঘর ছেড়ে বড়ো চেম্বারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ভারতবর্ষের থ্রী পার্সেন্ট প্রিভিলেজড পিপলের একজন হয়ে যাবে।

শুধু এই কারণে, নইলে, তোমাকে টিপিকাল বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি করে বিশ্বসংসদে পাঠানো যেত। তোমার বয়স মার্জিনাল—ফর্টি প্লাস মাইনাস টু। দেখে মনে হতে পারে চল্লিশের দু এক ঘর নিচে। দু এক বছর বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেখলেই মনে হয়, তোমার নাম শরৎ কিংবা গোবিন্দ। খুব আধুনিক হলে অরুণ কিংবা শ্যামল। এবং ছেলেবেলায় নিশ্চিত তোমার নাম ছিলো খোকা কিংবা বাবু। ঈষৎ ওলটানো ঠোঁটের ভাঁজে আদুরে ভাবটা তো এখনো লক্ষ করা যায়।

তোমার, এতদিনে, গণ্ডা খানেক ছেলেমেয়ে নিয়ে জীবনে সুস্থিত হওয়ার কথা। যার মানে, সম্পন্ন না-হলেও অনটনের ম্যালেরিয়ায় কাঁপতে হয় না। তুমি, দিব্য, একসময়, প্রথম তারুণ্যের প্রগলভতায়, ভেবেছিলে, এই সমাজ-ব্যবস্থা আমূল বদলানো দরকার, সেজন্য স্বপ্নদর্শী বাঙালী তরুণের স্বভাব-নিয়মে দাপাদাপিও কম করোনি। এখন অবশ্য 'আমূল' বলতে মাখন আর বেবিফুড ছাড়া অন্য কোনো ইমেজ তোমার চোখে ভাসে না। তোমার নিভন্ত-স্বপ্ন চোখের নিচে, হতাশার বলিরেখায়, 'এ-দেশের-কিস্যু-হবে-না' ভাব গেঁথে গেছে। তোমার এখন ভাববার সময় লাইফ ইন্সিওরেন্স আরো কয়েক হাজার বাড়াবে কিনা। এখন তুমি অনায়াসে সাক্ষাৎ-ভগবান কোনো 'বাবা'র খোঁজে ছোটাছুটিও করতে পারো। ফাঁড়া কাটাবার জন্য, প্রমোশনের মাংসের টুকরো যাতে ঠিক তোমার মুখেই পড়ে, কবচ-মাদুলি সন্ধান করাও দরকার।

তুমি, দিব্য, নিয়ম করে মাসে অন্তত চারবার সপরিবারে দামী রেস্টুরেন্টে চাইনীজ খেতে যাও। তোমার, যখন যেমন ইচ্ছা হয় হুইস্কির পেগের দাম মেটাও। (সুজয়ার কর্কশ অবিবেচনায় মৌতাত নষ্ট হয় বলে বাড়িতে পান করো না।) এখন যেহেতু, নামের আগে শ্রী/শ্রীমতীর মতো, স্কুলের নামের

আগে 'সেক্ট' না থাকলে তোমার মতো মানুষের যথার্থ ইজ্জত বজায় থাকে না, তাই, ছেলেমেয়েকে, অনেক ধরাধরি করে, তেমন স্কুলেই ভর্তি করেছ।

তোমার এমন ছকেবাঁধা, ফুটফুটে জীবন—এ্যালজাব্রার ফর্মুলার মতো—কী সরল, সাবলীল! পতিব্রতা স্ত্রী, শো-কেসের পুতুলের মতো সুন্দর সন্তান। হাতের নখে ঝকঝক করে সচ্ছলতা। এই নিয়ে, এ-ভাবেই তো, খুশি-খুশি পুষি-পুষি জীবনটা তোমার কাটিয়ে দেওয়া উচিত। সবাই যা করে।

তাহলে, দিব্য, কেন তোমার মনে হয়, তুমি একটা ভুল জীবনযাপন করছ। কেন মনে হয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংসারে স্বামী কিংবা পিতা কোনো ভূমিকাই তোমার পালন করার কথা ছিলো না। কেন ভাবো, কথা ছিলো না তোমার এই অফিসের তিন নম্বর এ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে জীবনযাপনের। কেন তোমার বারবার মনে হয় অন্য কোনো জীবন ছিলো তোমার প্রাপ্য?

দিব্য, জীবনে কজন মানুষ প্রার্থীত প্রাপ্য পায়? তুমিও কি জানো, কী আসলে প্রাপ্য?

বিকেল

চারটে নাগাদ দিনের সেরা বজ্রপাত হলো। খবরটা এলো। স্বপ্নের পরীর আঁচলে দিব্যর জন্য কিছু ছিলো না। তার অনেক জুনিয়ররাই পরীর সোনালি সোনালি বুকে মুখ ঘসে রাঙা হয়ে উঠলো। দিব্যর জন্য শুধু নিয়ন্ত্রিত, সুপরিমিত হাসি, বেটার লাক নেক্সট টাইম।

দিব্য খুব বেশি অবাক বা হতাশ হলো না। কিছু বেশি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুকের ইঞ্জিনটাকে ঠাণ্ডা হতে দিলো না। এবং তিনটে সিগারেট অতিরিক্ত পোড়ালো। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই।

জানাই ছিলো, ওর প্রতি ম্যানেজমেন্টের সুবিচারের অনুপাত সুদখোর ইন্টারেস্টের চেয়ে বেশি নয়। হলেই বরং ব্যালেন্স মিলত না। দিব্য আত্মস্থ প্রত্যয়ে নিজস্ব ফাইলে লেখে আমার প্রতি ম্যানেজমেন্টের সুবিচার-অবিচারের অনুপাত—২০ : ৮০, মানে, ১ : ৪।

অতিরিক্ত তিনটে সিগারেটের শেষটি এ্যাশট্রেতে ঘষতে ঘষতে দিব্যর মনে পড়লো, গত তিন বছর থেকেই ওর এ্যানুয়াল কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টে দারুণ ভালো ভালো ভারি ভারি কথা লেখা আছে—হার্ডওয়ার্কিং, সিনসিয়ার, অনেস্ট। এবং এই প্রমোশনটা তো অন্তত দুবছর আগে পাওয়া উচিত ছিলো। এইতো

ক'দিন, দু'মাস হবে বড়ো জোর, ফিনান্সিয়াল কনট্রোলার ওর পিঠ চাপড়ে সবার সামনে বলেছিলেন, ডিব-ও-ঔ য়ু আর গ্রেট!—সত্তর হাজার টাকা ট্যাক্স বাঁচিয়েছিলো তো দিব্য।

গ্রেট? মাই ফুট!

সেইসব স্বয়মাগতা দিনে সুজয়া যদি ইংরেজিতে বলতে চাইতো তাহলে ঠিক ঐরকমই বলতো বোধ হয়, দিব্য, য়ু আর গ্রেট!

গ্রেট হোয়াট? ট্যাক্স সুইণ্ডলার? ফাকার?

দিব্যর বারবার মনে হলো, এ-চাকরিটা ছেড়ে দেবে। এ-চাকরি ওর করার কথা ছিলো না। নিশ্চিত একটা ভুল চাকরি করছে। যেমন, ভুল জীবন। জীবন বদলানো যায় না?

চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা জানলা খুলে দিলো দিব্য। হু-হু বাতাসে কাগজপত্র উড়ে যায়। বাতাস কোনো লেখাপড়া জানে না। লাফালাফি করে সব কাগজপত্র কুড়িয়ে টেবিলের উপর গুছিয়ে রেখে পেপারওয়েট চাপা দিলো। দিতে দিতে ভাবলো, যাক শালা সব উড়ে। ভাবলো, তবু গুছিয়ে রাখলো ঠিক।

বাইরে এখনো বৃষ্টি। তারপর বাতাস। ধমকের মতো বিদ্যুৎচমকের সঙ্গে, মাঝে মাঝেই, বজ্রপাত চলছে।

অফিসঘরে বৃষ্টি নেই। কিন্তু একটু আগেই কী ভয়ঙ্কর বজ্রপাত ঘটে গেছে। প্রমোশন লিস্টে দিব্যর নাম ওঠেনি। দিব্যর হঠাৎ চিৎকার করতে ইচ্ছা হয়, কলেজ-জীবনে মুঠি উঁচিয়ে যেমন করতো—চলবে না। বন্ধ করো, বন্ধ করো। ভেঙে ফেলো—ভেঙে ফেলো—

বৃষ্টির এক ঝটকা ওর চোখে-মুখে লাগে। অল্প-অল্প ভিজে যায় শার্ট। স্নায়ু ঠাণ্ডা হয়। আর তখনই দিব্যর মনে হয়, যেন সমুদ্রে ভাসছে। ডিউক পিনাকী যেমন ভেসেছিলো।

বাদল-আঁধারে সমুদ্র তো দিকচিহ্নহীন কালো, ঘন কালো বিস্তৃতিই কেবল! জীবনের সমস্ত বিফলতার কালো কুণ্ডলীর ওপর দিব্য ভাসে।

সন্ধ্যা

ঠিক ছটায় দিব্য অভ্যস্ত টেবিলে এসে বসলো। কিছু বলার আগেই বাবুলাল ওর প্রিয় হুইস্কি আর জল নিয়ে এলো। দিব্য সোডা ব্যবহার করে

না। অভ্যাসমতো এক চুমুক দিয়ে বললো, থ্যাঙ্কু।

বাবুলাল জানে, দিব্য-আটটা সাড়ে-আটটা পর্যন্ত থাকবে। তিন পেগ খাবে তিন পেগের মাত্রা ছাড়ালেই বাবুলাল বোঝে, সাহেবের মেজাজ ঠিক নেই। আসলে, যেদিনই দিব্যর মনে হয়, জীবনটা একেবারে অর্থহীন, শুধু বেঁচে থাকা—মরতে না পেরে অনর্থক বেঁচে থাকা স্রেফ অক্ষম মূর্খতা, যেদিনই বুকের মধ্যে নিঃসঙ্গ শুকনো বাতাস ধুলো উড়িয়ে উদ্দাম ছুটে যায়, সে-সব দিনেই তিন পেগ ছাড়িয়ে যায়। থার্মোমিটারের দাগে অস্থিরতার জ্বর বাড়ে। চোখের তারায় তখন এই ঘর, ভিড়, সিগারেটের ধোঁয়া, বাবুলাল—কিছুই ধরা পড়ে না। সে-সব দিনে দিব্য অন্য কোনো জীবনে চলে যায়। যে জীবনে ও থার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট নয়, সুজয়ার স্বামী নয়, রন্টু-রিণির বাবা নয়।

চতুর্থ পেগ শেষ করার আগেই, সে-সব দিনে, ভেতর থেকে চঞ্চল শিশুটি বেরিয়ে আসে। তার চোখে পৃথিবীর প্রথম সরলতা, নিষ্পাপ কৌতূহল। 'চলো' বলে শিশুটি দিব্যর হাত ধরে কোনো একটা অন্যজীবনে নিয়ে যায়। পরে, দিব্যর মনে হয়, ও যেন সেই অন্য জীবন থেকে এই জীবনে মাত্রই বেড়াতে এসেছে।

দ্বিতীয় পেগে চুমুক দিতে দিতে মনে পড়লো, একবার শিশুটি ওকে নিয়ে গিয়েছিলো প্যারিসে। দিব্যর ছবির প্রদর্শনী চলছিলো। দেশবিদেশের নারী-পুরুষের ভিড়। সাধুবাদ, কটুক্তি। শ্যাম্পেনের বন্যায় ফুর্তির তুফান। শিল্পীইতো আসল ঈশ্বর!

আরেক দিন, শিশুটি ওকে বানিয়েছিলো দেশনেতা। মন্ত্রী। হাতের মুঠি উঁচিয়ে, গলার শিরা ছিঁড়ে ময়দানে বক্তৃতা দিয়েছিলো। কিছু কাজ হচ্ছে না—বলে, গর্জন করে উঠেছিলো জাঁদরেল সব সেক্রেটারিদের ওপর। জনগণমঙ্গলের চেয়ে পবিত্র কাজ আর তো কিছু নেই!

অন্য একবার দিব্য হয়েছিলো ইউ-এনের সেক্রেটারি-জেনারেল। পৃথিবীর তাবৎ সমস্যা মুহূর্তে মিটিয়ে দিয়েছিলো। কোথাও আর কোনো যুদ্ধ সংঘর্ষ ছিলো না। সৌহার্দের চেয়ে প্রিয়তর আর কী আছে!

কী অনায়াসে কতো বিচিত্র সব জীবনে শিশুটির হাত ধরে, কিংবা শিশু নিজেই, দিব্য চলে যেতো। ফিরে এসে, ফিরে তো আসতেই হয়, দিব্য হতো অনেকটাই নতুন মানুষ। তখন, অন্তত দুটো দিন, নতুন দিব্য ও পুরানো দিব্যর অনুপাত থাকে ৮০ : ২০। সংসার ও অফিসের জন্য ২০%এর বেশি

দেবার কোনো মানে হয় না তো।

বাবুলাল তৃতীয় পেগ নিয়ে এলো। জল মিশিয়ে চুমুক দিলো দিব্য। সিগারেট ধরিয়ে সতেরো সেকেণ্ড লম্বা টান দিয়ে খালি বুকটা ভরিয়ে ফেললো। মাঝে মাঝে বুকটা এতো খালি লাগে।

হঠাৎ একটা কাশির দমকে এক দলা ধোঁয়া ছিটকে এসে চোখ-মুখ ভরিয়ে ফেলে। চোখ জ্বালা করে। তখন মনে পড়ে, শেষবার শিশুটি নিয়ে গিয়েছিলো এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর, রমণীয় জীবনে। কোনো, স্বপ্নের পরীই তার চেয়ে বেশি কিছু আর দিতে পারতো না। ঐ একটা জীবন থেকেই দিব্যর আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়নি।

এইরকম ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো মেঘ-জমা গহন পাহাড়ে ছোট্ট গ্রাম। ছোট ছোট পাহাড়ী কুঁড়ে-ঘর। দিব্য সেখানে একজন হাভিজা। ট্রাইব্যাল। সারাদিন ঝুম চাষ করে, শিকার করে। দিনান্তে গ্রামের যৌথাবাসের সামনে নাচ, গান। ঘরে তৈরি মদ পান। চোখের তারায় ছটফট করে সম্পন্ন-স্বাস্থ্য উজ্জ্বল তরুণীরা। দু' টুকরো কাপড়ের অন্তরালে প্রতিটি শরীরই সবল শিল্প। ঈষৎ ভ্রূ-ভঙ্গীতেই যে-কোনো শিল্প হতে পারে করতলগত। এর চেয়ে সুন্দরতম অনঘ জীবন কি স্বপ্ন অতিক্রম করেও ভাবা যায়!

সে-রাতে দিব্য সারা শরীরে জঙ্গলের ঘ্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলো। রক্তে শিকার-সংগীতের আরণ্যক রণন। কুঁড়েঘরে ঢোকার দীর্ঘ অভ্যাস বশতই যেন কুঁজো হয়ে পেরিয়েছিলো ছ'ফুট দরোজা। সারারাত অবিরাম 'রুহ' নাচে। ২০% দিব্য ৮০% হাভিজাকে বলেছিলো, তুমি আমাকে একেবারে নিয়ে নাও। আমি সংসার, অফিসের ১০%+১০%+৮০%=১০০%—৮০%=২০% =১০%+১০%···এই জটিল অঙ্ক প্রত্যহ আর মেলাতে পারছি না।

পরদিন সকালে চা দিতে এসে সুজয়া মুখ টিপে বললো, কাল তোমার কি হয়েছিলো?

মাথার মধ্যে তখনো ড্রিং-ড্রিং-রা-রা-পাহাড়ী সুর নেচে বেড়াচ্ছিলো। চোখ না খুলেই দিব্য বললো, কি হয়েছিলো?

পরমুহূর্তে চোখ খুলেই মনে হয়, এ কে? ওর বউ? যাকে ন' বছর আগে বিয়ে করেছিলো? নাকি সেই যৌবনোচ্ছল পাহাড়ী মেয়েটা কাল সারারাত যাকে নিয়ে অন্তরকম তাজমহল নির্মাণ করেছিলো! চোখ কচলে আবার তাকায় দিব্য। না, কোনো ভুল নেই। এ-তো সুজয়াই। ওর স্ত্রী।

জীবনসঙ্গিনী শব্দটাও এখন ঠিক মানিয়ে যায়। কিন্তু, দিব্যর মাথার মধ্যে জিজ্ঞাসু বিস্ময় গ্রীবা তোলে, তাহলে, ওর, সুজয়ার, মুখ অমন লাগছে কেন—হুইস্কির গ্লাসে আলো পড়লে যেমন দেখায়! ঠোঁটের কোণেও কীরকম হাসি ঝোলানো! হাসির স্টিকারও পাওয়া যায় নাকি আজকাল।

সুজয়া ঝুলন্ত হাসিটাকে সুস্থির উজ্জ্বল করে বললো, কেন, তোমার মনে নেই কিছু?

কথা না-বলে দিব্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সকালের প্রথম তরল উষ্ণতা তারিয়ে উপভোগ করে। সেই মুহূর্তেই মনে হয়, সুজয়ার গলা কী দারুণ নরম, সুরেলা।

সুজয়া আদরের হাত দিব্যর খোলা পিঠে বুলোতে বুলোতে হঠাৎ চিমটি কেটে বললো, বয়স বাড়ছে না কমছে!

চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে দিব্য বললো, থেমে আছে।

—তাই-ই বটে! সশব্দে হেসে ওর পিঠে মুখ রাখে সুজয়া।

দিব্যর আবার মনে হয়, সুজয়ার এই গলাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের টপ্পার গূঢ় কাজ তোলার উপযুক্ত। এই স্বর, এতদিন—যেন কতো কল্পান্ত—কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল? এইভাবে ইচ্ছামত স্বরভঙ্গ স্বরবিভক্তি ঘটাতে সুজয়া যে কী করে পারে!

পরে, সেদিনই রাত্তে, শুয়ে-শুয়ে দিব্যর মনে পড়েছিলো, আগের রাতটা নিশ্চিত সুজয়ার ক্যালেণ্ডারে মার্ক-করা দশ-রাতের একটি ছিলো। নিজের আচ্ছন্নতায় দিব্য বুঝতে পারেনি। সেজন্যই সকালে অমন মাখন-মাখন গলা।

তৃতীয় পেগ শেষ করে দিব্য আজ সকালের সুজয়ার গলার সঙ্গে সেদিন সকালের গলা মেলাবার চেষ্টা করলো। দুর-দুর! পাঁচটা গাধা আর পাঁচটা হরিণ—এর মধ্যে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কিছু হয় না। সুজয়া যে কেমন করে নিজের মধ্যে দশটা গাধা-হরিণ পুষে রাখে!

বাবুলাল নিয়মমাফিক কর্তব্যপরায়ণতায় বললো, স্যার, তিনটে হয়ে গেছে।

দিব্য মুখ তুলে তাকালো। এ-লোকটা কে? আগে কখনো দেখেছে কি? কেন খামোখা বিরক্ত করতে এসেছে? বাবুলালের অনাবশ্যক উপস্থিতি নস্যাৎ করে দিয়ে দিব্য আবার গ্লাসের উপর চোখ রাখে। মাথা নিচু।

তাতার সৈন্যেরা অবিশ্রাম ছুটছে। আদিগন্ত পদধ্বনি শোনা যায়। চোখের সামনে দিকচিহ্নহীন কালো সমুদ্র। ঢেউয়ের মাথায় টলটল দোলে মনোগ্রাম-করা রুমালের মতো ফেনা। মনোগ্রামে আঁকা আছে দিব্যর স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্খা-ভরা সমগ্র জীবনের ক্যাপসুল।

শিশুটি বেরিয়ে আসে ধীরে ধীরে। দিব্যকে ডাক দেয় নতুন জীবনের দিকে। দারুণ মজা লাগে ওর।

—চিয়ার্স! গ্লাস তুললো দিব্য। খালি।

বাবুলাল নির্বিকার, অভ্যস্ত, চোখে দেখছিলো। আবারো বললো, তিনটে হয়ে গেছে স্যার।

দিব্য ঘড়ি দেখল। আটটা চল্লিশ। ধ্যুৎ, দশটা চল্লিশ হলেই বা কী! —আরেকটা!

তক্ষুণি বাবুলাল বুঝে গেল, আজ সাহেবের মাথার মধ্যে নির্ঘাত গ্যাস জমেছে। এক-একজনের এরকম জমে মাঝে মাঝে। তখন যতো উদ্ভট কাণ্ড করে। এ-সাহেবকে নিয়ে অবশ্য সে ভয় নেই। ঠিক বিল মেটাবে। একটুও সোরগোল করবে না। ওর বরাদ্দ টিপস্‌ও দিয়ে যাবে। সতেরো বছরে এই বারে না-হোক অন্তত সতেরো হাজার লোক দেখেছে। কিন্তু এইরকম অদ্ভুত মানুষ আর দেখেনি। এ-সাহেব যেন ঘরের বদলে কোনো মন্দিরে বা লাইব্রেরীতে আসে ; ঘন্টা কয়েক ধ্যান বা পড়াশোনা করে ফিরে যায়।

পাঁচ পেগের মাথায় বাবুলাল গেটে ট্যাক্সির জন্য বলে এলো। ও জানে, তিন পেগের পরই সাহেব অন্যরকম হয়ে যান! তখন ট্যাক্সির দরকার।

দিব্য তখন শিশুটিকে বলে, চলো, সমুদ্রে যাই। বহুদিন যাইনিতো!

আদিগন্ত সমুদ্রের ওপর তাতার সৈন্যের মার্চ কী দারুণ! দিব্য জুতোয় তাল দেয়, চলরে চলরে চল—

ট্যাক্সিতে উঠে দিব্য দেখে, সমুদ্র কী বিরাট। চারিদিকে শুধু জল আর জল।

এই বিশাল সমুদ্রে ও কী ভীষণ একা।

রাত

ভেলার মতো ভাসতে ভাসতে ট্যাক্সিটা নিয়ে এলো দিব্যকে। ডিউক-পিনাকী এরকমই ভেসেছিলো। আমেরিকার মাটিতে প্রথম পা-রেখে যে-

অনুভূতি, শিহরণ হয়েছিলো কলম্বাসের, অবিকল সেই অনুভূতি নিয়ে দিব্য ট্যাক্সি থেকে নামলো। কোটি ঝুরি বেয়ে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। তুমুল বাতাস তাতার সৈন্যের ক্ষিপ্রতায় ছুটে যাচ্ছে। দিব্যর আবার মনে হয়, এমন বাতাস 'শ' দিয়ে লেখা উচিত।

ভাড়া মিটিয়ে, গেট পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই বজ্রপাত।

—তোমার কি কোন একটু দায়িত্বজ্ঞান নেই! একবারও ভেবেছ ছেলেমেয়ে নিয়ে কীভাবে এই ঘরে আছি! ছাইভস্ম গিলে মাঝ-রাত্তিরে—

ঘটি-বালতি-টিনগুলো কোরাসে জলতরঙ্গ বাজায়। বজ্রপাত না থাকলে এই সুরধ্বনি ভালোই লাগতো। মনে হয়, বজ্রপাত আজ আর থামবে না। বাড়িওলা-মিস্ত্রি-ঝি-র কামাই—নামতা পড়ে যাচ্ছে সুজয়া। তা যাক। ভিতরে জমা বাষ্পের নির্গমন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কেবল, গলায় যদি একটা সাইলেন্সর থাকতো!

—ঘরে এলে তো আর কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে। বোবা। একটা কথাও কি কানে যাচ্ছে!

দিব্য জুতো খুলে চটি পরে। আড়চোখে দেখে, সুজয়া খাওয়ার আয়োজন করছে। ওর কর্তব্যপরায়ণতার সত্যিই কোনো তুলনা হয় না তো! মাসান্তে, না ভুল হলো, মাস পয়লায়, নিয়মিত সেলামি দিয়ে যাওয়ার জন্য ওর, দিব্যর যেটুকু—হোকনা ১০%—মনোযোগ প্রাপ্য, তাতে কোনো ঘাটতি রাখে না সুজয়া। এই সরল স্বীকৃতি দিব্য মরতে মরতেও দিয়ে যাবে। বাকি ১০% পাওয়ার আজ অবশ্য কোনোই চান্স নেই।

—ভূতের মতো বসে আছো যে! ফের সিগারেট ধরিয়েছ? খেয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করো। তারপর যতো খুশি টানো। রন্টুটার দুপুর থেকে জ্বর, খবর রাখো—

একবারও লাইন ভাঙে না, হোঁচট খায় না শব্দের উপর, কখনো খুঁজতে হয় না কোনো বিশেষ শব্দটি, পাংচুয়েশনও নিখুঁত রেখে কী ভাবে সুজয়া অবিরল বকে যায়—একটা বিস্ময়! না, মেসিনগান বলবে না দিব্য, পাশের বাড়িতে ওয়াটার-পাম্প যেমন নিশ্ছেদ রিদমিক শব্দে অবিরাম চলে, সুজয়ার ভোকাল পাম্পও, এখন আর কর্ড বলা যায় না তো, তার চেয়ে এতটুকুও কম পাওয়ারফুল নয়।

কিন্তু, ও, দিব্য, এইতো ফিরলো। কী করে জানবে, রন্টুর জ্বর। এবং সুজয়াও তো জানতে চাইলো না স্বপ্নের পরী ওকে শূন্যহাতে ফেরালো কেন! কোনো আগ্রহই নেই। আর যদি দিব্য বলে, ডাক্তার-ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, সুজয়ার পাম্প চালু হয়ে যাবে—না, তোমার জন্য বসে আছি। তুমি এই মাঝরাত্তিরে ডাক্তার আনবে তো! ন্যাকামি!

দিব্য, শত হোক, বাপ তো। উঠে গিয়ে বিছানায় ছেলেকে দেখে। মেয়েকেও। আবার ছেলেকে। ওরতো জ্বর! মুখটা শুকনো। ঠোঁটের ভাঁজে দুষ্টু দুষ্টু আদুরে-আদুরে ভাবটা ঠিক আছে। আমারই ছেলেতো!

—থাক। ঢং করে ওদের আর জাগাতে হবে না।

বাড়ানো হাতটা গুটিয়ে ফেললো দিব্য। ছেলের মুখের উপর ৩০° অ্যাঙ্গেলে ঝুঁকে-থাকা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, ৭১ কেজি শরীরটা মেঝের উপর লম্বমান করতে গিয়ে, যাকে বলে তড়িৎগতিতে, ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়। নৌকার বৈঠার মতো বাঁ পা উঠে, ছাদ-গলা জল ধরার জন্য যে নীল প্লাস্টিকের বাকেট রাখা ছিলো পাশে, তার পূর্ণগর্ভ পেটে আঘাত করে। সেই মুহূর্তে দিব্য যে তৎপরতা দেখায় তাতে লেভ ইয়াসিনও লজ্জা পেতে পারতো। একটু জলও পড়তে দেয়নি। দুহাতে বাকেটটা এমন যত্নে ধরে, যেন রন্টুকেই ধরেছে। নিজেকে তিনশো উল্লাস জানিয়ে, সোজা স্থির হয়ে দাঁড়াতেই, কম্পাসে মেপে, ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপর, একটা মিসাইল এসে পড়লো। মিসাইল-ই, জলের ফোঁটা কখনো অতো বড়ো হতেই পারে না।

—খুব জল পড়ছে, না!—তালু মুছে দিব্য বললো। সুজয়াকে শোনাবার জন্য না, এমনিই বললো।

—হঠাৎ আবিষ্কার করলে মনে হচ্ছে!—একলহমাও দেরি হলো না বজ্রপাতে।

দিব্যর কেন যেন, একেবারে অকারণে, হাসি পেয়ে গেল। হাসি লুকোবার জন্য বারান্দায় সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলো, বৃষ্টি আর পড়ছে না। আকাশে, ঘুমের মধ্যে রিণির মুখে যেমন হাসি-হাসি আলতো-ভাব লেগে থাকে ঠিক তেমনি আলো-আলো ভাব। রাস্তার ওপারে মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ তাল-গাছটার মাথায় একটা একাকী নক্ষত্রও। বাতাস ঝাঁপাঝাঁপি না করে যেন সদলে মার্চ করে চলেছে।

শিশুটি বললো, সমুদ্র দেখবে—সমুদ্র? স্তব্ধ আকাশের অল্প-অল্প আলোর নিচে সমুদ্রের রূপ দারুণ মায়াবী!

স্ত্রীকে ডাকলো দিব্য, চলো, ছাদটা দেখে আসি। জল কিছু কমলো কিনা—

—এই রাত্তিরে গিয়ে আর কী হবে। সারাদিন কিছু করলে না—

আজকাল যা করে না, এখন তাইই করলো দিব্য। কথার মাঝখানেই থামিয়ে দিলো সুজয়াকে। বাঁ হাতে কাছে টেনে বললো, চলো না, দেখেই আসি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে চিলেকোঠার দরজা খুললো। চৌকাঠের গায়ে জলের ধাক্কা আটকাবার জন্য কয়েকটা ইট পাতা আছে। সেখানে সুজায়াকে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে ধরে দাঁড়িয়ে, দিব্যর ন্যাট কিং কোলের 'ক্যালিপ্সো ব্লু' গাইতে ইচ্ছে করলো—ওয়াউ-ওয়াউ-আয়ে—

মানুষের কখন যে কী মনে পড়ে!

সারা ছাদের এপার-ওপার জুড়ে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। আবছা অন্ধকারে, পাশের বাড়ির ছায়ায়, কার্নিশ দেখা যায় না। দিব্য দেখে, আদিগন্ত জল। কী আশ্চর্য, আকাশে সপ্তর্ষিও উঠে এসেছে। ছাখো, ছাখো, ঋষিরা কী মায়াবী সমুদ্র!

তাতার সৈন্যরা হঠাৎ আবার ডবল মার্চ শুরু করে। বাতাসের ঝাপটায় ছাদের জল হাততালি দেয়। দিব্য দেখে, ওকে ডাকছে।

শিশুটি বললো, তুমি যে যাবে বলেছিলে!

দিব্য শাড়ি-সামলাতে-ব্যস্ত সুজয়ার দিকে তাকালো। ওর মুখটা তো আসলেই কঠিন নয়। এখন কেমন স্নিগ্ধ কোমল দেখাচ্ছে। নিশ্চয় ও সুজয়া, দিব্য বললে, এখনই 'বাজে করুণ সুরে' নির্ভুল গেয়ে দেবে। গলায় একটুও টোল পড়বে না।

—দেখা হয়েছে? এবার চলো—

আঃ! এখনই, ঠিক এই মুহূর্তেই, তোমাকে এই স্বরে কথা বলতে হলো! সাইলেন্স ইজ গোল্ড—যদি না-ও জানো, রোজ একটু মধু খেতে তো পারো!

এসব কথা দিব্য উচ্চারণ করেনি। পাগল!

জেটের শব্দে আবার বৃষ্টি নামে। তাতার সৈন্যরা উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে

পড়ে। আকাশের মৃদু হাসি নিঃশেষে মুছে যায়।

সুজয়া হাত ধরে টানে, নিচে চলো।

দিব্য বলে, সমুদ্র কী সুন্দর, দেখেছ! চলো, আমরা দুজনে এক সঙ্গে ঝাঁপ দি।

সোনার ছুরিতে আকাশের পেট চিরে বিদ্যুৎ চমকায়। দিব্য দেখে, শিশুটি এক গাল হেসে ওকে ডাকছে।

দিব্য লাফ দেয়। ছাদের জল প্রায় হাঁটু সমান। চটি ছুঁড়ে ফেলে দিব্য লাফাতে লাফাতে ছাদের মাঝখানে চলে যায়। মুহূর্তের মধ্যে হাড় পর্যন্ত ভিজে ওঠে। মাথার মধ্যে ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা উদ্দাম ছোটে। ওদের ক্লান্তি নেই। কতো দম ওদের!

চিৎকার করে ডাকে দিব্য, জয়া—জয়া—এসো। গ্যাখো, সমুদ্র কী সুন্দর! কি দারুণ! জয়া—লক্ষীটি—এসো, দুজনে মিলে এই সমুদ্র পেরোই।

সুজয়া বুকের মধ্যে একটা ঢেউয়ের ফুলে ওঠা টের পায়, যার নাম উদ্বেগ। এই ঢেউ, ন' বছর আগে, দিব্যর অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হলেই ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। আনম্র, ভূমিমুখী বুকের ওপর থেকে আঁচল খসে যায়। কণ্ঠার কাছে শীত-শীত লাগে।

দিব্য নর্তকের ভঙ্গীতে সামনে দু'হাত বাড়িয়ে, অচেনা মুদ্রায়, গলা ফাটিয়ে, বৃষ্টি আর বাতসের উতরোলের মধ্যে বলে, জয়া—তুমি সেই গানটা গাও না 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'—গাও না জয়া—গাও—

—পাগলামি করো না। ফিরে এসো—ফিরে এসো—

সুজয়ার গলা—এখন আর পাম্প না, কর্ডই—দিয়ে শব্দগুলো করুণ, সুরেলা, আর্ত স্বরে, বেরুবার আগেই, কিংবা হয়তো শব্দগুলোর ওপরই, চরাচর কাঁপিয়ে বজ্রপাত হয়। সত্যিকারের বজ্রপাত। সারা বাড়ি, আকাশ, পৃথিবীর সঙ্গে সুজয়ার অস্তিত্বও কেঁপে ওঠে।

দিব্য, শিশুর মতোই, দু'হাত সামনে বাড়ায়, জয়া, কত দূরে তুমি—আমাকে ধরো—জয়া, অতদূরে কেন তুমি—

কতদিন—ক-ত-দি-ন—দিব্য এভাবে ডাকেনি।

স্বপ্নবিপণী

সরঞ্জাম সামান্য। পাঁচ ফুট বাই তিন ফুটের একটা কাঠের ট্রে টেবিলের মতন পোর্টেবল স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখা। তার মধ্যে নানান রঙের কাগজে মোড়া ছোট ছোট প্যাকেট। শাদা হলে হোমিওপ্যাথির পুরিয়া বলে ভ্রম হতে পারত। সব প্যাকেটের ওপর ১, ২, ৩—ইত্যাদি নম্বর লেখা। নম্বর অনুযায়ীই ভাগে ভাগে সাজানো। মনে হয়, টেবিলটা যেন রং-বাহারে মোজেক করা।

পিছনে মাথার ওপরে শাদা কাপড়ের গায়ে প্যাকেটের মতনই নানা রঙের অক্ষরে লেখা—

পছন্দমত স্বপ্ন দেখুন

গোপন স্বপ্ন সফল করুন

ছড়ার ছন্দে শ্লোগানটা দিয়েছিলো ঈশান। ওর মাথায় সারাক্ষণ নানারকম চিন্তা-ভাবনা রেসের গাড়ির মতন উদ্দাম ছোটে; কিন্তু কোথাও পৌঁছায় না। জিষ্ণু মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রায়ই ভাবে, ঈশানের মাথায় নিশ্চিত কোনো গোপন খনি আছে— মৌলিক, একেবারে ওরিজিন্যাল, ভাবনা-চিন্তার।

শ্লোগানটা লিখে দিয়ে ঈশান বলেছিলো, দ্যাখ জি, তোর ব্যবসা চলুক বা না-চলুক, ব্যাপারটাকে একটা মুভমেন্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

—মুভমেন্ট! ব্যাবসার সঙ্গে মুভমেন্টের কী সম্পর্ক?

বাঁ হাত মুঠো করে বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মধ্যবর্তী গর্তে ঠোঁট ডুবিয়ে সিগারেটে লম্বা টান দিলো ঈশান। দু'চোখ বোজা। ধোঁয়া টানা ও ছাড়ার মধ্যে পুরো আঠাশ সেকেণ্ড সময় পোড়ে ও ওড়ে। চোখ খুলে বলে—ভেড়ো,

বাঙালীর মতন বোকামি করিস না, জি। একটু ম্যাচিওরড্‌হ’। নাকের ডগা ছাড়িয়ে দেখ।

এখন মিনিট পাঁচেক নিশ্চিন্ত। ঈশান ওরিজিন্যাল চিন্তায় বীজ ছড়াবে। বেশির ভাগ সময়ে সে-বীজে কোনো অঙ্কুর গজায় না। গজাবার কথাও নয়। এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকোয়াল টু—ঐ যে সবাই শিখেছিলো ক্লাস ফাইভে, সারাজীবনে তার থেকে এক চুলও কেউ নড়বে না। দু’য়ে দু’য়ে ছাড়া আরো যে নানা, অসংখ্যভাবে চার হতে পারে, কেউ সেকথা ভাবে না। ভাবতে চায় না।

ঈশান বললো, মানুষের জীবনে, অন্তত এই কলকাতার মানুষের জীবনে, এখন কোনো স্বপ্ন নেই। কেউ আর স্বপ্ন দেখে না। দেখতে ভুলে গেছে। তুই এই স্বপ্ন দেখার নেশাটা ধরিয়ে দে। স্বপ্ন না দেখলে কেউ কখনো স্বপ্নাতীত কিছু ঘটাতে পারে?

জিষ্ণু যেই বলেছিলো, শানু, চাকরি তো পাবো না। ব্যবসা করবো ঠিক করেছি, ঈশান, একেবারে যেন স্প্রীং-বোর্ড থেকে, লাফিয়ে উঠেছিলো—ব্যবসা! দ্যাটস্ গুড। এ্যাদ্দিনে একটা মানুষের মতন কথা বললি, জি। আচার্য রায় সেই কবে বাঙালীকে ব্যবসামনস্ক হবার জন্য বলেছেন—কেউ কি শুনলো! সবাই শালা চাকরি করবে। কেরানীবাবু হবে। ওরে অজ্ঞ, তোদের স্রেফ পানবিড়ি বেচেই বিহার-উড়িষ্যার মানুষগুলো কত টাকা কামিয়ে নিচ্ছে খেয়াল রাখিস?

ঈশান আরো বলেছিলো, লড়ে যা, জি। আমি আছি তোর সঙ্গে।

ওর থাকাটা নিঃসন্দেহে এক বিরাট খবর। বছরের সেরা খবরও বলা যায়। কেননা ঈশান তো কোথাও থাকার মানুষ নয়। যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সবলে সরগরম হয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু যখন থাকে না অর্থাৎ সরে যায়, একটি শ্বাসও জোরে ফেলে না। সিগারেটের টুকরো ছাড়া কোনো চিহ্নই রেখে যায় না। ওর থাকাটা বিপদেরও। ঈশান এমন মানুষ নয় যে, বাস্তববুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসার সুবিধে-অসুবিধে বুঝবে। ওরিজিন্যাল চিন্তার চাষ করতে গেলে সেটা সম্ভব নয়।

স্টাণ্ডার্ড স্বপ্নের তালিকা করতে বসেই বিপত্তি। জিষ্ণুর লেখা তালিকা নির্দয়ভাবে, খ্যাচ-খ্যাচ করে কেটে বললো— জি, তুই কি কোনোদিন ম্যাচিওরড্‌ হবি না। স্বপ্ন-দেখাটাকে মুভমেন্ট হিসেবে তৈরী করতে হলে

এ-তালিকা চলবে না। মানুষকে পড়তে দে, জানতে দে, স্বপ্ন কত রকমের হয়, হতে পারে।

জিষ্ণু তালিকায় সেই সব স্বপ্ন রেখেছিলো, যেগুলো, ওর ধারণা, মানুষ সাধারণভাবে, সহজে বেশি করে চাইবে। যেমন, ভালো চাকরি, অনেক টাকা, সুন্দর বাড়ি, মেয়ের বিয়ে, প্রেমিকা-প্রেমিকা লাভ, চিত্রতারকার সঙ্গে সহবাস। ঈশান অস্বীকার করে না এগুলোরই ডিম্যাণ্ড বেশি হওয়ার কথা। তা, বাবার গুডসের ডিম্যাণ্ডও আজকাল খুব। স্বপ্ন না বেচে সেসব বেচলেই হয়। মতি-শীলের ফুটপাথে বসলেই চলবে। কিন্তু স্বপ্ন-ব্যবসাকে যদি শিল্পের ডাইমেনশন দিতে হয়, তাহলে পুরো ব্যাপারটা ওরিজিন্যালি ভবেতে হবে। বিকিকিনি লক্ষ্য নিশ্চয়; তবে, সেই ঘাস-বিচালি ব্যাপারটাকেও ভিন্নতর রূপ দিতে, শিল্প-সম্মত করার চেষ্টা করতে ক্ষতি কী!

ঈশান বললো, এসব যা লিখেছিস, এগুলো কি স্বপ্ন? একে স্বপ্ন বলা যায়?

জিষ্ণু বললো, কেন সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কি এর চেয়ে বেশি কিছু? অন্য কিছু? তুই ভালো করেই জানিস, বাঙালী মাত্রেই অর্থপিপাসু আর সেক্সহাংগ্রী। শুধু বাঙালী বলি কেন, এভরি ইনডিয়ানই তাই।

—আমি মানি না। কিন্তু সে তর্ক থাক। তুই ১, ২, ৩ করে যা-লিখেছিস, এগুলো তো জীবনের পাঁচালী। এর মধ্যে স্বপ্ন কোথায়?

—বাঁচতে, শুধু কোনো রকমে বেঁচে থাকতেই যাদের আয়ু শেষ হয়ে যায়, তারা আর কী স্বপ্ন দেখবে শানু?

দুজনে মিলে, অনেক মাথা খাটিয়ে, তিন প্যাকেট সিগারেট পুড়িয়ে, শেষ পর্যন্ত সাতচল্লিশটা স্ট্যাণ্ডার্ড স্বপ্ন ঠিক করলো। লিস্টের তলায়, ফুটনোটে, লিখলো—লিস্টের বাইরের স্বপ্ন অর্ডার-মাফিক সাপ্লাই করা হবে।

কোথা থেকে শুরু করবে, এক জায়গাতেই দাঁড়াবে, নাকি ভিন্ন ভিন্ন দিনে বিভিন্ন জায়গায়, পুলিশী হামলা হবে কিনা, হলে কি করা—এসব নিয়েও প্রচুর গবেষনা করতে হলো। ব্যবসা মোটেও সহজ সরল ব্যাপার নয়। এত-বেফয়দা চিন্তা— যার মধ্যে কোন মৌলিকত্ব নেই—করার জন্য ঈশান ঘাড়ের ওপর মাথাটা বয়ে বেড়াচ্ছে না।

—তাহলে, ডালহৌসি, মানে, বিবাদী বাগেই শুরু করি। জিপিও বা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি কাল থেকে।

—না। ঈশান ধমকে উঠলো।—উঃ, জি, তুই আমায় পাগল করে দিবি। তোদের সৌরজগতে ডালহৌসিই সূর্য। আর কিছু মাথায় আসে না! যে-কোনো লোককে রাস্তায় জিজ্ঞেস কর—কোথা হইতে আসিতেছ? ঠিক বলবে, ডালহৌসির ব্যূহ হইতে।—কোথায় যাইতেছ? ডালহৌসির গুহায়। এ মাইরি, গোরুর রচনাকেও ছাড়িয়ে গেল।

গোরুর রচনার গল্প সকলেই জানে। সেই যে ছেলেটা একটা রচনাই মুখস্থ করেছিলো—গোরু; তারপর পরীক্ষায় যে রচনাই আসুক, নদী, শিক্ষা, ভ্রমণ—ছেলেটা ঐ গোরুই লিখে আসত। কেউ যদি বলতো, তোর লেখাটা হয়নি, ছেলেটি উত্তর দিত—কেন, আমি তো লিখেছি।

জিষ্ণু বিরক্ত হয়ে বললো, কোথা থেকে শুরু করবো, সেটা বলবি তো!

—বলবো। তার আগে বল, তুই কি বিক্রি করবি।

—স্বপ্ন। সেতো ঠিক হয়েই আছে।

—সেকেণ্ড লাইনটার কোনো দরকার ছিলো? তোদের মুশকিল কি জানিস, কিছুতেই প্রিসাইস, টু-দ্য-পয়েন্ট হতে পারিস না। বেনোজল মিশবেই। এ দেশের জল হাওয়ারই দোষ!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঈশান। এত চেষ্টাতেও বন্ধুর উন্নতি ঘটানো গেল না বলে দুঃখিত বোধ করে।

—যাকগে। সো, তুই বেচবি স্বপ্ন—ড্রীম। দাদের মলম না, ব্রেসিয়ার না, লটারীর টিকিটও না। অতএব, বিবাদীবাগে ধর্ণা দেবারও কোনো দরকার নেই। এদেশের গ্রেটেস্ট এ্যাণ্ড লাস্ট ড্রীমারের পদতল থেকে শুরু কর। ওখানে, মানে বিবাদী-বাগে, যদি যেতেই হয়, পরে যাবি।

জিষ্ণু ক্রুদ্ধস্বরে বলে—ধুত্তেরি! ভ্যানতাড়া ছেড়ে জায়গাটার নাম কর দেখি।

—রবীন্দ্র সদনের সামনে। রবীন্দ্রনাথের পদতলে ঠিক হবে না, কাছাকাছি। ওখানে এখন মাসখানেক ধরে কালচারের হরেকরকম্বা চলবে। উল্টোদিকে গোটা কয়েক একজিবিশন। প্রচুর ভিড় হবে। ওটাই ঠিক জায়গা টু স্টার্ট সেলিং ড্রীম। কাল বিকেল চারটেয়, ঐ কী যেন বলে, কিক্-অফ। ভয় পাসনে, আমিও থাকবো। ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় দেখতে হবে।

পরদিন বিকেল চারটের অল্প আগে জিষ্ণু সরঞ্জাম নিয়ে রবীন্দ্রসদনে পৌঁছে গেল। এবং কী আশ্চর্য, ঈশান ওরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সারা-জীবনে যা কক্ষনো হয়নি। চব্বিশ ঘন্টা লেটও যার কাছে একটু দেরি মাত্র, কেননা, সময়টা কোনো ফ্যাক্টরই নয়—আসল কথা, হোয়াট ইউ কনসিভ এ্যাণ্ড হোয়াট ইউ প্রডিউস,—সেই ঈশান আজ এসে দাঁড়িয়ে আছে! ভাবা যায়!

জিষ্ণুর মুখের বিস্ময় দেখে ঈশান বললো, অনেকক্ষণ এসেছি। পারি-পার্শ্বিকটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

একটু থেমে আবার বললো, বোধহয় ভুলই করলাম রে। স্বপ্ন বিক্রির জন্য এটা হয়তো ঠিক জায়গা নয়। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত রকমের লোক দেখলাম। সব যেন ঘোরে আছে। কারুর পায়ের তলায় মাটি আছে বলে মনে হলো না। এরা কী স্বপ্ন দেখবে!

সিগারেটের ক্ষীণ টুকরোটা পায়ের তলায় ক্ষুব্ধ—নাকি হতাশ?—ভাবে চাপে ঈশান। চিন্তিত মনে হয় ওকে। বিষণ্ণও। অথচ বিষণ্ণ চিন্তা ওর ধাতে নেই। হতাশা, বিষণ্ণতা সংক্রামক। জিষ্ণুর সব উৎসাহ ম্লান হয়ে যায়, হঠাৎই। ওর সব আশাই এই ব্যবসার মধ্যে নিয়োজিত। বেশ কিছু খরচও করেছে। খরচের জন্য ধার করেছে। এখন যদি কেউ না কেনে, একটা স্বপ্নও যদি বিক্রি না হয়, তবে? জিষ্ণুর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে কদম গুণে-গুণে নামতে থাকে।

ওর চোখের ফেড-হয়ে-আসা ঈশানের নজর এড়ায় না। হতভাগাটা এখনো কাঁচা রয়ে গেছে। ও ঈশানের কথার মানেই বোঝেনি।

বললো, এই শালা, মুখখানা ওরকম ভিজে পাঁউরুটির মতন করেছিস কেন? টেবিল পাত, মাল বের কর। ঘাবড়াবার কিছু হয়নি, বাচ্চু। ঈশানচন্দর যতক্ষণ আছে, তোর নুক্কুতে চুমু খাবার লোকের অভাব হবে না। ছাখ না কী করি! লাগা—ফেস্টুনটা বের কর—

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টেবিল পাতা হয়ে গেল। নম্বর অনুযায়ী সাজানো হলো নানা রঙের স্বপ্ন-প্যাকেট। হাওয়ায় দুলতে লাগল শাদা-কাপড়ে রঙ-বাহারী ছড়া—

পছন্দমত স্বপ্ন দেখুন

গোপন স্বপ্ন সফল করুন

ইংরেজি ও বাংলায় দুটো স্ট্যাণ্ডার্ড স্বপ্নের লিস্ট টেবিলের দু কোণে করা ফ্রেমে লাগিয়ে দিলো। লিস্ট দুটোও নানা রঙে চিত্রিত। এক-একটা স্বপ্ন এক-এক রঙে লেখা—সুন্দর ও বড়ো অক্ষরে, যাতে অল্প আলোতেও পড়তে অসুবিধে না-হয়। কলকাতার রাস্তার আলো উজ্জ্বলও নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়।

—লাইট এনেছিস ?

জিষ্ণু মাথা নাড়ে। কার্বাইড ল্যাম্প এনেছে একটা। ব্যবসা জমলে হ্যাজাক কিনবে।

আস্তে আস্তে টেবিল ঘিরে লোক জমতে লাগল। প্রথমে অল্প-বয়েসীরা —যাদের বলা হয়, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী। কয়েকজন বুড়ো শালিকও জুটে গেল। সবাই পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার মতন ছড়াটা পড়লো। লিস্টের স্বপ্নগুলো পড়লো। প্যাকেটগুলো দেখলো। কৌতূহলী। সন্দিগ্ধ। অবিশ্বাসী।

একটা ছোকরা সতীর্থ একজনকে বললো, দেখেছিস, মাইরি, অর্ডার-মাফিক স্বপ্নও বিক্রি হচ্ছে। মানুষের নিজস্ব আর কিচ্ছু রইলো না। এভরিথিং ইজ এ কমোডিটি !

ঈশানের তক্ষুনি কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করছিলো। বললো না। গভীর মনোযোগে, উদাসীন ভাব বজায় রেখে, মেয়েগুলোকে দেখছিলো। দু'একটা তো বেশ দেখতে। যেন, ফিল্ম-ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে। একটা মেয়ে বিশেষ-ভাবেই ওর সমস্ত মনোযোগ দখল করে নিলো। মেয়েটি শরীরে ঠিক সেই ফিগার ধরে রেখেছে, যার জন্য ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল। সিল্কের শাড়ির অন্তরাল থেকে শরীরের তীক্ষ্ণ রেখা যেন বলছে, স্বপ্নেও কি তুমি এর চেয়ে ভালো কিছু দেখেছ ?

বেরসিক মানুষের কখনো অভাব ঘটে না। ঠিক এই সময়েই একজন মাঝবয়েসী লোক বললো, এই যে সব লিখে রেখেছেন, সত্যি-সত্যি এ-সব স্বপ্ন দেখা যায় ?

জিষ্ণু জবাব দেয়—হ্যাঁ। আপনি যে-স্বপ্ন নেবেন, সেটাই দেখতে পাবেন। নিয়ে দেখুন একটা। দেখুন না, কোন স্বপ্ন আপনার পছন্দ।

যে-মেয়েটির শরীরে ঈশানের চোখ এ্যাডহেসিভে জুড়ে গিয়েছিলো, তার সঙ্গী যুবকটি বললো, যদি দেখতে না-পাই—মানে যে-স্বপ্ন আমি দেখতে চাই, সেটা যদি না দেখি—

জিষ্ণু উত্তর দিতে যাচ্ছিলো। ঈশান ওর বাহু ধরে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমরা বলবো না যে, আপনার চোখের দোষ। বলবো, আপনি আদত্তেই জানেন না, কী স্বপ্ন আপনি দেখতে চান।

—কী বলতে চাইছেন আপনি? যুবকটি চেঁচিয়ে উঠলো।

—উত্তেজিত হবেন না।—ঈশান ধীর স্বরে বলে—যদিও প্যাকেটের, মানে ড্রীম-ক্যাপের, ভেতরে নিয়মাবলী দেওয়া আছে, তবু বলছি আপনি যে স্বপ্নটা কিনবেন, ঘুমোবার আগে, এই কথাটা মনে রাখবেন, ঘুমোবার আগে, শোয়ার আগে না, শোয়া এবং ঘুমোনো এক নয়—অর্থাৎ যখন আপনি ঘুমুতে যাবেন বা চাইবেন, ঠিক তখন আগেও না, পরেও না—যে স্বপ্নটা আপনি কিনেছেন, মানে যে-স্বপ্নটা আপনি দেখতে চান, সে-সম্পর্কে এক মিনিট, হ্যাঁ, মাত্র এক মিনিট, ভালো করে ভাববেন—ইচ্ছে মতন খরোলি ভাববেন। আপনি যেমন ভাববেন, স্বপ্নটাও ঠিক তেমনি দেখবেন। আংশিক ভাবলে আংশিক দেখবেন, সম্পূর্ণ ভাবলে, সম্পূর্ণ দেখবেন। এ-ভাবে আপনি নিজেই আপনার স্বপ্ন নির্মাণ করবেন, নিয়ন্ত্রণ করবেন। আপনার পছন্দমতন স্বপ্নই আপনি দেখবেন। এক মিনিট ভাবার পর, প্যাকেটের মধ্যে যে-জিনিষটি আছে, সেটা আপনার নাকে, চোখে ও বুকে লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। ঘুমোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন।

একটু থেমে, সেই যুবকটিকে উদ্দেশ করে বললো, আপনাকে বলছি—যদি দেখতে না-পান পছন্দমত—বা, যদি ভুল স্বপ্ন দেখেন, তবে জানবেন, আপনি ঐ এক মিনিট সময় ঠিকভাবে ভাবতে পারেননি, কী আপনি দেখতে চান। তার মানেই হলো, আপনি আপনার চাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত নন।

উপস্থিত ভিড়ের মধ্যে চাপা হাসি খেলে গেল। এটাই চাইছিলো ঈশান। যুবকের মুখ বিব্রত। ঈশান ঠিক দেখলো, মেয়েটির মুখে নরম হাসি, বাউল বিভায়, আলপনার মতন আঁকা। হঠাৎই যেন গলার কাছে শুকনো লাগে।

নিজের অস্বস্তি কাটাবার জন্য, সামনের লোকগুলোকে আর একবার খুঁটিয়ে দেখে, স্মার্ট ভঙ্গীতে বললো, টেস্ট অব দ্য পুডিং ইজ ইন ইটস ইটিং—কথাটা পুরোনো। আমরা বলি, কোন ঠোঁটের কী স্বাদ ঠোঁট না-ডোবালে বোঝা যায় না। বলতে বলতে ঈশান লক্ষ্য করে, মেয়েগুলো গালে টয়েটো ঘষে, চোখ ঘামিয়ে, সঙ্গীর কানে ফিসফিস করে, গায়ে চিমটি কাটে—আমরা

সাতচল্লিশটা স্ট্যাণ্ডার্ড স্বপ্ন ঝুলিয়ে রেখেছি। এর যে কোনোটায় আপনারা ঠোঁট ডুবিয়ে দেখতে পারেন। কোনটা চান বলুন—

সামনে ভিড়টা থাকে। কিছু মানুষ চলে যায়! আবার অন্য কয়েকজন এসে দাঁড়ায়। যেমন বাসস্টপ। পড়ে, দেখে, নিজেদের মধ্যে কথা বলে। কেউই কেনে না। জিষ্ণুর চোখ আরো ম্লান। ঈশান অস্থির বোধ করে। রক্তস্রোত দ্রুতগতি হয়।

—শালার মাকড়া সব। মনে মনে গর্জন করে ঈশান। কিমুক না-কিমুক কেউ একটা কথাও বলছে না। জিজ্ঞেসও করছে না কিছু। কারুরই যেন কিছু জানার নেই, ভাবার নেই, বোঝার নেই। এই সব মানুষের নতুন কিছু গ্রহণ করার মতন সবল পাকস্থলী নেই, বোঝা যায়। কৌতূহলও নেই? অল্ ডাম্ব এ্যাণ্ড ফুলস!

মাথার বড়ো বড়ো চুল ঝাঁকিয়ে ঈশান শানানো স্বরে বললো, আপনারা কেউ কোনো স্বপ্ন দেখতে চান না? কোন স্বপ্নই পছন্দ হচ্ছে না কারুর?

গলায় ওর চ্যালেঞ্জ ছিলো। গোপন, মৃদু তিরস্কার। আধখানা পিনকুশনের মতন ভিড়ে কথাগুলো স্পিন করে খানিক। কিছু কিছু মুখ স্পষ্টতই বিব্রত। জিষ্ণু লক্ষ্য করে। কয়েকজন দ্রুত সরে যায়। ঈশান নিশ্চিন্ত হয়, বরফ ভাঙার অপেক্ষা কেবল। একটা সাহসী হাত এগিয়ে এলেই, অনুসরণকারীর অভাব হবে না! জিষ্ণুর মুখে সামান্য ফোকাস। আশা। ঈশানের ঠোঁটের ভাঁজে এক টুকরো হাসির চুমড়ি। তাচ্ছিল্য।

সেই মেয়েটি, যে, ঈশানের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিলো, ঈশান ঠিক করতে পারছিলো না, মেয়েটির নাম জুলিয়েট, ইলেকট্রা, পার্বতী না কুসুম দেবে, হঠাৎ বললো—অনুচ্চস্বরে, আপনমনে, নাটকে যেমন স্বগতোক্তি—শুধু শুধু স্বপ্ন দেখে কী লাভ! সত্যি তো আর হবে না!

ও পার্বতী! ও ইলেকট্রা! ও জুলিয়েট! ও কুসুম! তুমি এত নিরাশ কেন? ঈশানের সত্তার গভীরে নিঃশব্দ আর্তনাদ কঁকিয়ে ওঠে। তোমার ঐ শরীর, রূপ-যৌবন, তুমি তো এখন পৃথিবী-জয়ের স্বপ্ন দেখবে। ধৈবত-নিষাদে কথা বলবে তুমি। এমন ম্লান ষড়জ-ঋষভ তোমাকে মানায় না! কে তোমার গলায় ঢেলেছে তরল দুঃখ? ঐ যুবক? ত্যাগ করো তাকে। কে তোমার চোখে লাগিয়েছে বিবর্ণ কাজল? কলকাতা? পোড়াও তাকে। ডোবাও

বঙ্গোপসাগরে !

—কী বলেছিলাম ! মানুষ আর স্বপ্ন দেখে না, দেখতে চায় না । ভুলে গেছে স্বপ্ন দেখতে । ফিসফিস করে জিষ্ণুকে বললো ঈশান ।

জিষ্ণু মাথা নাড়ে । ওর বুকের মধ্যে একটা বেলুন ভীষণ ফুলে ওঠে— ইলাসটিসিটির শেষ সীমা পর্যন্ত । বেলুনটার গায়ে জীবনানন্দীয় ধূসরতা আঁটা ।

শরীরটা ইস্কেলের মতন ঋজু করলো ঈশান । গাড় চোখে মেয়েটিকে দেখলো একবার । তারপর, "আত্মার যে উপাদানকে আমরা বিক্রম বলেছি,··· সেই বিক্রম উচ্চাকাঙ্খাকে অন্বেষণ করে"— গ্লকনকে এই কথা বলার সময় সক্রেটিসের স্বরে যে প্রখর দৃঢ়তা ছিল, ঠিক সেই স্বরে ঈশান বললো, আপনি কথাটা ঠিক বললেন না । স্বপ্ন না-দেখলে কিছুই করা যায় না । যে-কোনো আবিষ্কার, সাফল্য, মহৎ কাজের পেছনেই আছে, কোনো-না-কোনো মানুষের অসম্ভব কোন স্বপ্নদর্শন । কলম্বাস-লিভিংস্টোন, এডিসন-আইনস্টাইন, লেলিন-সুভাষ বোস বা রবীন্দ্রনাথ, যাঁর কথাই বলুন, প্রত্যেকেই প্রবল স্বপ্নদর্শী ছিলেন । ছিলেন বলেই তাঁরা স্বপ্নটাকে জীবনে সফল করায় জন্য আমরণ চেষ্টা করে গেছেন । সফলও করেছেন । আমরা ঠিক এই কারনেই, এই স্বপ্ন-বিপণি খুলেছি । যাতে আপনি আপনার আকাঙ্খিত স্বপ্ন দেখতে পারেন । এবং স্বপ্নটা দেখলেই কেবল আপনি তাকে বাস্তবে সত্য করে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন ।

এরপর বরফ গলতে আর দেরী হলো না । মাঝবয়েসী সংশয়ী মানুষটিই প্রথম স্বপ্ন কিনলেন —বাড়ি । পরপর অনেকগুলো স্বপ্ন বিক্রি হয়ে গেল । জিষ্ণু নম্বর অনুযায়ী স্বপ্ন দিয়ে টাকা নেয় । ওর মুখের ওপর ফোকাস এখন জোরালো । খুশি ।

ঈশান একটা খাতা খুলে স্বপ্ন-ক্রেতাকে বাড়িয়ে দেয় । খাতায় নাম, পেশা, বয়স ও স্বপ্নসংখ্যা—এই চারটি ঘর কাটা আছে । এটাও ওর ওরিজিন্যাল চিন্তার ফসল । জিষ্ণু জানতই না । এক ফাঁকে বুঝিয়ে বললো, স্টাডির জন্য এটা দরকার । কোন ধরণের, কোন বয়েসের মানুষ, কোন স্বপ্ন নিচ্ছে তা জানা যাবে । সেই অনুযায়ী প্রয়োজন মতন স্বপ্ন-তালিকায় যোগ-বিয়োগ করবে । চাহিদা মতন যোগান বজায় রাখবে ।

—তোর জবাব নেই, শানু! জিষ্ণু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো। ও জানলো না ভাবলোও না, ঈশানের আসল উদ্দেশ্য কী।

কেউ কেউ খাতা লিখতে আপত্তি করলো। মানুষ যে কত বিচিত্র! স্বপ্ন অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় ব্যাপার! বোঝানো হলো, ঠিকানা তো চাওয়া হচ্ছে না। ভয়ের বা জানাজানির কোনো কারণই নেই। লেখাটা বরং ক্রেতারই স্বার্থে। যদি কেউ আদপেই স্বপ্ন না-দেখেন, দেখতে না-পারেন, তবে প্যাকেটের কাগজটা ফেরৎ দিলেই, খাতা মিলিয়ে, মূল্য ফেরত দেওয়া হবে। তবুও, কিছু কিছু অবুঝ মানুষ রাজী হলো না। সেসব ক্ষেত্রে ঈশান নিজেই নামের ঘরটা খালি রেখে, বাকী ঘরগুলো ইচ্ছামতন ভরে গেল।

প্রথম দিনে ১১৯টা স্বপ্ন বিক্রি হলো। জিষ্ণু দারুন খুশি!—উঃ যা ভয় হচ্ছিল, শানু! কেবলি মনে হচ্ছিল কেউ বোধহয় একটাও নেবে না।

ঈশান জবাব দিলো না। খাতা দেখে, একটা আলাদা কাগজে লিখছিলো, বাড়ি—২১, চাকরি—৪৩, অনেক টাকা—২৪, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-খেলোয়াড় (যে যা হতে চায়)—১৩, প্রেমিক-প্রেমিকা লাভ—৭, বাকি অন্যান্য।

এই সবগুলোই জিষ্ণুর লিস্টের স্বপ্ন। ঈশাণের চিন্তার একটা স্বপ্নও কেউ নেয়নি। যেগুলো নিয়েছে, সেগুলো কি স্বপ্ন? ওর মধ্যে স্বপ্ন কোথায়? যা আদৌ স্বপ্ন নয়, সেই স্বপ্নহীন স্বপ্নই মানুষ চায়। কেউ—একজনও দেখতে চায় না সত্তিকারের স্বপ্ন? কেউ চায় না, এই শহরটা সুন্দর হোক? কারুর ইচ্ছে করে না, এমন একটা কিছু করতে, যাতে ক্যান্সার হবে না, শিশুমৃত্যু হবে না, দুর্ভিক্ষ হবে না, যুদ্ধ হবে না? স্বপ্নেও এমন কিছু ভাবতে চায় না কেউ! ডেসমণ্ড মরিস্ই ঠিক তবে, আমরা আসলেই 'হিউম্যান-জু'র বাসিন্দা!

ঈশানের মনে পড়লো, সেই মেয়েটি—জুলিয়েট বা পার্বতী বা ইলেকট্রা বা কুসুম—কোনো স্বপ্ন নেয়নি। কেন? টাকা ছিলো না? ঈশানের ইচ্ছে হয়েছিলো, একটা ফ্রি দেয়। কোনটা দেবে? কোন স্বপ্ন দেখতে চায় মেয়েটি? জানার কোনো উপায় নেই। এবং পোষাকে, শরীরে, হাসিতে, উচ্চারণে, টাকা-না-থাকার কটু গন্ধ তো ছিলো না। ওটা একটা আলাদা গন্ধ, টাকা-না-থাকার, গণগন্ধ যার নাম দিয়েছে ঈশান। ও খুব ভালোই চেনে। তাহলে ও-মেয়ে কেন কোনো স্বপ্ন নিলো না? মেয়েটি কি আবার আসবে? যদি আসে—যদি কেন, ঈশান নিশ্চিত, আসবেই—তবে, জেনে

নেবে, মেয়েটির আকাঙ্ক্ষায় গোপন আছে কোন নিভৃত স্বপ্ন !

পরদিন মেয়েটির কথা ভাবারই সময় হলো না।

একই জায়গায় চারটে থেকে বিকিকিনি শুরু করলো। সাজিয়ে-গুছিয়ে দাঁড়াবার পর বেশিক্ষণ শূন্য সময় গুণতে হয়নি। লোক্যাল ট্রেনের স্টেশনের মতন, পরপর, অনেক হাত এগিয়ে এলো, পছন্দমত স্বপ্ন তুলে নিতে। গতকাল যারা বিশ্বাসের পুঁজি ভাঙিয়ে স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলো, তাদের কেউ-কেউ এসে বলে গেল, এরা—স্বপ্ন-বিপণির দুই যুবক—হস্তারক নয়; বিশ্বাসের। কেউ-কেউ, যাদের বক্ষ-প্রাণ সবুজ ও সতেজ, খুবই উচ্ছ্বসিত—যেমন, আচমকা-খোলা বিয়ারের বোতল; যাদের, আধুনিকতার অনুশাসনে সর্পজিহ্বা, তারা বললো, ঠিক যেমনটা ভেবেছিলো, তেমন হয়নি। তবু দেখেছে—যদিও, আরো ভালো হতে পারত। হ্যাঁ, মানতেই হবে, ব্যাপারটায় ধাপ্পা নেই, ভাঁওতা নেই। চারশ' কুড়ি বলা যাবে না কিছুতেই।

ওতেই মাগনা বিজ্ঞাপন। মুখে মুখে এই বার্তা রটে যায়। সামনে কৌতূহলী যারা দাঁড়িয়েছিলো, তাদের অতি-উৎসাহী দু' একজন সফল স্বপ্ন-দর্শীকে ডেকে বললো, হ্যাঁ, দাদা, সত্যি-সত্যি স্বপ্ন দেখেছেন নাকি? ইচ্ছেমতন স্বপ্ন?

কালকের প্রথম ক্রেতা, মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, ঈশানের খাতায় কেদারনাথ পুরকায়স্থ, ৪৮, মুখে অনেক খুশির রং মেখে বললেন, দেখেছি বই কী। না-দেখলে আবার কিনতে আসি!

আজো শোনা গেল—কী তাজ্জব! অর্ডার মাফিক স্বপ্ন—ইচ্ছামতন স্বপ্ন। ভাবা যায়!

ঈশান চুপ। কেবল খাতা বাড়িয়ে দিচ্ছে ক্রেতাদের। কেউ-কেউ ওকেই লিখে নিতে বললো, নাম, বয়েস ইত্যাদি। ও লক্ষ রাখে কোন স্বপ্নগুলো উঠে যাচ্ছে মানুষের পকেটে বা ব্যাগে। মানসাঙ্ক করে যায় সন্তর্পণে। গত কালেরই পুনরাবৃত্তি চলছে। স্বপ্নহীন স্বপ্নই চায় মানুষ। তিনজন নিয়ে গেল, চিত্র-তারকা বা আকাঙ্ক্ষিত রমণীর সঙ্গে সহবাসের স্বপ্ন! ছোঃ!

ভিড় অনেক বেশি আছে। বিক্রি ঠিক তার, ভিড়ের, আনুপাতিক না। জিষ্ণু তাতেই দারুণ খুশি। ওর মুখে ছটফট করে উল্লাস। ঈশান বলার আগেই দু' রাউণ্ড চা বলেছে। সিগারেট বাড়িয়েছে। ঈষৎ গম্ভীর ঈশান। চোখে সামান্য কৌতুক।

হঠাৎ একজন এগিয়ে এসে বললো, আপনাদের লিস্টে কোনো পলিটিক্যাল ড্রীম তো দেখছি না।

চোখ তুলে মানুষটিকে দেখলো ঈশান। টেরিকট প্যান্টের ওপরে ঝুল-বারান্দার মতন ভুঁড়ি-ঢাকা হলুদ সিল্কের হাওয়াই সার্ট। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। হাতে ব্রীফকেস। ঠিক সেই মানুষ, নজরানা না-দিয়ে যার সঙ্গে অফিসে দেখা করা যায় না; কফি-হাউসে মার্ক্স-লেনিনের কোটেশন না-দিয়ে কথা বলে না; রাস্তায় মিছিলের জন্য ট্রাম-বাস আটকালে বিরক্ত হয় এবং বহুদিন আগেই জেনে গেছে, সোস্যালিজম ছাড়া এদেশের কিচ্ছু হবে না। কেবল একজন লীডার চাই—মাওর মতন, লেনিনের মতন—তাহলেই রেভ্যুলিউশন তুবড়ির মতন গেঁজিয়ে উঠবে। আর সেজন্যই, জানালায় দাঁড়িয়ে বিপ্লব দেখবে বলে, অফিস থেকে হাউস-লোন নিয়ে অ্যাবসট্রাক্ট আর্টের গ্রীল লাগিয়েছে জানালায়, বারান্দায়।

জিষ্ণু বললো, না, আমরা পলিটিক্যাল স্বপ্ন বেচি না।

—দ্যাটস টু ব্যাড। কেন, রাখেন না বলুন তো!

ঈশান জবাব দেয়, আমরা রাখি না, কারণ, বড্ড কমপিটিশন।

—কমপিটিশন! ভদ্রলোকের ভুঁড়ি চমকে ওঠে—আর কেউ স্বপ্ন সেল করে নাকি? আই নেভার হার্ড—

গাড়ল—এই শব্দটা চার ইঞ্চি অক্ষরে নিওন্ আলোয় জ্বলে ওঠে ঈশানের চোখে। কলকাতায় কত গাড়ল আছে তার কোনো সমীক্ষা করা হয়নি কখনো। যেমন হয়নি, কলকাতায় কত প্রেমিক আছে, কজন স্বপ্নদর্শী আছে, কজন খাঁটি বিপ্লবী আছে, কত পাগল (উন্মাদ না) আছে—তারও কোনো বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা। নির্মলকুমার বসু কলকাতার সমাজ-সমীক্ষা করেছেন, এসব কেন বাদ দিলেন, ঈশানের জানতে ইচ্ছে হয়। বসুমশাই মরে না-গেলে ও ঠিক গিয়ে জিজ্ঞেস করত।

জিষ্ণু ততক্ষণে জবাব দিয়েছে—না, না। আমরা ছাড়া আর কেউ স্বপ্ন বিক্রি করে না।

এটা কোনো জবাব হলো? এরপরে ছড়া-লেখা ফেস্টুনে, 'আমাদের কোনো ব্রাঞ্চ নাই' লিখবে নাকি জিষ্ণু? ঈশানের মগজে হঠাৎই ব্লাস্টিং হয়। গলার স্বর মধ্যমে রেখে বলে, খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, শহীদ মিনারের নিচে, আজকাল আবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডেও শুরু হয়েছে—পলিটিক্যাল স্বপ্ন

একেবারে ঢালাও মাগনা সাপ্লাই হয় তো, সেই কমপিটিশনে আমরা পেরে উঠবো না। ওটা তো ঠিক ফেয়ার কমপিটিশনও নয়।

সেই মুহূর্তে ভদ্রলোকের বিপ্লবী মুখ একটা দর্শনীয় ব্যাপার। আহা! দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এই মুখের একটা মূর্তি গড়ে গেলেন না। ভদ্রলোক, এই অবস্থায় যে-কোনো ভদ্রলোকের মতনই, অকারণে, ভারি শরীরের গূঢ় বিক্ষোভে—যাতে, সার্টের আয়ু একটু কমা ছাড়া আর কিছুই ঘটে না—সপ্তমে কিছু বেকুব শব্দ বমি করবেন বলে গলার শিরা গুলতির মতন টান করলেন। কিন্তু তক্ষুনি—না, তার আগেই—আশে-পাশের লোকগুলো হুয়া-হুয়ার কোরাসে হো হো হা হা করে উঠলো। গাড়ল গাছে ধরে না, সত্যিই। তখন অবশ্য ভদ্রলোক সবেগে প্রস্থান ছাড়া আর কীইবা করতে পারতেন।

—বেড়ে বলেছেন, মাইরি!—কে একজন বললো।

আরেকটা গাড়ল। ঈশান ভাবলো, এখানে আরো কত গাড়ল আছে রে বাবা!

জিষ্ণু আড়চোখে বন্ধুকে লক্ষ করছিলো আর আপনমনে, নিঃশব্দে, হাসছিলো। এই নাহলে আর ঈশানচন্দর! মাল কোথায় খাপ খুলতে এসেছিলো টের পায়নি! ঐ ভদ্রলোকের মতন মানুষগুলোকে ঈশান বলে, জন্ম-জরদ্গাব; অনড্বুহ। লোকগুলো অন্য কিছু তো থাকই, বুদ্ধিদীপ্ত যৌনসংগমও করতে জানে না। কীনসের মতন কোনো সমীক্ষা করলে নির্ভুল জানা যেত, এদের মেজরিটির অর্গাজম ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। হবে কী করে? ও ব্যাপারটাও জানতে হয়, শিখতে হয়। ওর জন্যও বুদ্ধি লাগে। প্রপিতামহের পুতি আমি—এই অহংকারেই, 'তুম কৌন, হম ক্যায়া' ভাব! সব পিপুফিশুর দল।

স্বপ্ন বিক্রির রকম দেখে জিষ্ণু বোঝে, ঈশান বলেছিলো ঠিকই—মানুষ আসলেই স্বপ্ন দেখতে চায় না। স্বপ্নহীন স্বপ্ন বেচে টাকা আসছে। রূপালী খুশিও হচ্ছে। সেই সঙ্গে ধোঁয়াও জমছে—হতাশার। আরো বেশি, কারণ, ঈশান রেগে যাচ্ছে। এই ক্ষুব্ধ মুখ, ঈশানের, ভালোই চেনে জিষ্ণু।

—একটা সতেরো নম্বর দিন তো।

সতেরো নম্বর—চাকরিতে প্রমোশন। জিষ্ণু দেখলো, একটা ২৪/২৫ বছরের যুবক। সুকুমার মুখ। যে-মুখে এখনো শিউলি-কুঁড়ির শিশির জমে আছে।

ঈশান খাতা বাড়িয়ে বললো, আপনি এক নম্বর স্বপ্নটা নিন না!

ছেলেটি, খাতা থেকে ঈশান পড়লো—পারিজাত চট্টোপাধ্যায়, ২৪, ইঞ্জিনিয়ার, লিস্ট থেকে এক নম্বর—আমি একজন…মানুষ—পড়ে বললো, ওটা আবার স্বপ্ন নাকি! আমি কি মানুষ না?

ঈশান বললো, আপনি প্রাইমেট। আপনি হোমো-সেপিয়ান। এবং আপনি ইঞ্জিনিয়ার। ব্যস, আপনি কেবল তাই-ই?

বিহ্বল শব্দটার বিশেষ ব্যবহার নেই। এখন পারিজাত চট্টোপাধ্যায়ের চোখের মুখের প্রায়-অনঘ অভিব্যক্তিতে নিখুঁত মিলে যায়। ঈশানের মৃদু শঙ্কা, ছেলেটি রেগে যাবে, ভুল প্রমাণ করে, নরম, যাকে বলে স্খলিত স্বরে বললো, আপনি কি বলতে চাইছেন?

মানুষ বলতে আপনি কী বোঝেন? সোজা মেরুদণ্ড, বাইপেডালিজম; কানের ওপর ডারউইন মার্ক, কথা, ভাষা, পোশাক, কালচারের পুরুষানুক্রমণ? র‍্যাশান্যাল এ্যানিমেল? টুল-মেকিং এ্যানিমেল? ডাক্তার—ইঞ্জিনিয়ার—মন্ত্রী—চোর—কামুক—খুনী—ব্যবসাদার—রেপিস্ট? বা সৎ—অমায়িক—সহৃদয়—উদার—সহিষ্ণু—জেন্টল—পোলাইট? পোলাইট, শব্দের অবিকল প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নেই বলেই বোধহয়, আমাদের আচরণ হয় হুকুমদারী নয় জো-হুজুর!

কথাগুলো কণ্ঠাগত হলেও ঈশান উচ্চারণ করেনি। বদলে, হাসিহাসি মুখে, যেন বরফকুচি—স্নোফ্লেকস—ছুঁড়ছে, এমন ভঙ্গিতে বললো, আপনি ইয়াং বলেই বলছি। স্বপ্ন দেখতে চান, আরো বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হবেন, বড়ো পোস্টে যাবেন। ধরুন, গেলেনও। তাতে মানুষ হিসেবে কি আপনি বড়ো হবেন? কী রকম বড়ো হবেন? বড়ো মানুষের ধারণাটা আপনার কী? আমি আপনাকে সেই স্বপ্নটাই দেখার কথা বলছিলাম। আপনি স্বপ্নেও সে-কথাটা ভাববেন না?

পারিজাতের প্রথম প্রতিক্রিয়া—যাঃ বাব্বা! স্বপ্ন কিনতে এসে জ্ঞানলাভ? এ-যেন সেই পাণ্ডবদের জলের খোঁজে গিয়ে বক, মানে যক্ষ, মানে ধর্মর কাছে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপার। কে হে জ্ঞানদা তুমি? এমন ভাবলো ঠিকই; আবার একটা কৌতূহলও সুষুম্নাকাণ্ডের কাছে, এ্যাকুইরিয়ামের মাছের মতন, ঘুরতে লাগলো। মিনিট দুয়েক। তারপরই টুকুস হেসে বললো, বলছেন যখন, দিন।

অনেক কাল আগে, ওয়ান্স আপন এ টাইম, রিলে-রেসে দৌড়েছিলো ঈশান। টু হাণ্ড্রেড কি ফোর হাণ্ড্রেড মনে নেই। সেটা জরুরিও ছিলো না। প্রায় সবার শেষেই, দৌড়তে-দৌড়তে তিনবারের চেষ্টায় কোনোরকমে ব্যাটনটা পরের রানারের হাতে গছাতে পেরেই, ওহো! কী অ্যাচিভমেন্ট— মনে হয়েছিলো। ছুটন্ত হাত থেকে আরেক উন্মুখ হাতে ব্যাটনের যাত্রা, সে কী সোজা ব্যাপার! শরীরে শিহরণ ঐসব মুহূর্তেই কেবল, অস্তিত্ব কাঁপিয়ে ধরা দেয়।

ঠিক সেই শিহরণ, ছেলেবেলায় গল্প শোনার দিনগুলোর মতন, আজ আবার অনুভব করলো ঈশান। এবং সেদিনের পর আর কক্ষনো দৌড়াদৌড়ির দুর্বোধ্য ব্যাপারে জড়িয়ে মৌলিক মেধা ক্ষয় হতে দেয়নি যেমন, আজো তেমনি এই ফালতু বেচাকেনার মধ্যে বেফায়দা গা-ঘষতে আর রুচি হলো না। ওর মৃদু উচ্চারণ জিষ্ণু বুঝে উঠতে পারার আগেই ঈশানের দীর্ঘ চেহারা চোখের আড়ালে সন্ধ্যার ভিড়ে টুপ করে ডুবে যায়। ঈশান এভাবেই যায়, নিঃশব্দে। ফিরে তাকানো কী, ও জানে না।

দিনাতিপাত, অ্যাসেমব্লি লাইনের মতন, ক্রমিক ও যান্ত্রিক। একা-একা টাকা গুণে, খাতা লিখে, লোকেদের অনাবশ্যক প্রশ্নের নিরর্থক উত্তর দিতে দিতে জিষ্ণু ক্লান্তবোধ করে। টাকার প্রতিদিনই বেড়ে-ওঠায় ছেদ পড়লো না দেখে, উৎসাহের পাতার সবুজ সতেজই রইলো। ক্লোরোফিল পেস্টও অত তাজা থাকে না। ঈশানের জন্য চিন্তিত হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। আবার মনে না-পড়লে, ইচ্ছে না হলে ও আসবে না। দুজনে পাশাপাশি যত হেঁটেছে তার যোগফল রামনাথ বিশ্বাসের টোটাল মাইলেজের চেয়ে কম নয়!

প্রতিদিনই টাকার বেড়ে ওঠা একটা রহস্যময় ব্যাপার। বাবল-গেমের মতনই মজার। জিষ্ণু যখন স্বপ্নের পশরা নিয়ে দাঁড়ায় পকেটে কোনো টাকা থাকে না। মানে, রাখে না। ভাবতে মজা লাগে, সামনে দিয়ে চলমান মানুষগুলোর প্রত্যেকের কাছেই, পকেটে বা ব্যাগে, কিছু-না-কিছু টাকা আছে, থাকেই, অথচ ওর পকেটে নেই, থাকে না। যখন বাড়ি ফেরে ঐসব পকেট বা ব্যাগের টুকরো-টুকরো অংশই ওর পকেট ভারি করে তোলে— এই ব্যাপারটা জিষ্ণু রীতিমত উপভোগ করে। টাকার মতন স্মার্ট কোনো মেয়ে হয় না। গ্রেশাম, ফিশার, কেনস, স্যামুয়েলসন, ফ্রিডম্যান পড়ে এসব বোঝা যায় না। সেজন্যেই বড়বাজারের ভুঁড়িদাররা ওসব বই, ভুলক্রমেও, বাইশ ইঞ্চি চাকি

দিয়েও ছুঁয়ে দেখে না।

ঈশান এলো শনিবারের সন্ধ্যায়। সে-সন্ধ্যাই রবীন্দ্রসদনের হরেকরকম্বার শেষ রজনী। ভিড় এমন দিনের উপযুক্ত মতন। জিষ্ণু বাস্ত হাতে প্যাকেট বাড়ায়, খাতা লেখে, টাকা গোনে। একের মধ্যে তিন কীভাবে হয়, জিষ্ণু সেই গোপনলীলাই দেখায়।

পিঠে হাত দিয়ে ঈশান বললো, বেশ চালাচ্ছিস দেখছি।

ঘাড় ঘুরিয়ে জিষ্ণু যাত্রার ভিলেনের মতন চোখ তুললো। দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ করে বেরুলো—শালা!

ঈশান হাসলো। যার মানে, কেন বেকার রাগ করছিস। আমাকে তো জানিসই!

খাতাটা তুলে উল্টে দেখলো, হাফ-ফুলস্কেপ আট নম্বর প্রায় শেষ। ব্যবসা ভালোই জমেছে। দ্রুত স্বপ্নসংখ্যার ওপর চোখ বুলিয়ে গেল। একই ব্যাপার। ভূষিমালের এত কদরের রহস্যটা কী? মাঝে মাঝে দু' একজন যারা রিয়েল ড্রীম নিয়েছে, ওদের নামগুলো সোনার কালিতে, না, রক্তের অক্ষরে লেখা উচিত ছিলো। সেই মানুষগুলোকে দর্শন করা হলো না বলে ঈশানের চোয়াল ভারি হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে একটা উষ্ণ হাওয়া দুঃখের নিশান নাড়ে।

—এবার নীলামবালা ছ'আনা হলেই তো হয়!

—মানে?

—সাতচল্লিশ কমিয়ে ষোল-সতেরো করে নীলামবালার মতন, ফেরি করলেই চলবে। দেখছিসই তো, স্বপ্ন-ফপ্ন কেউ দেখতে চায় না। সবাই কেবল, কোনো রকমে বেঁচে থাকতে চায়। স-ব কাম্যুর মডার্ন মেন—রিড নিউজ-পেপার অ্যাণ্ড ফরনিকেট।

এভাবে নয়; এমন গূঢ় চিন্তা ওর মাথায় আসে না। তবু জিষ্ণু ভেবেছে, ভূষি-বিক্রির কোনো মানে হয় না। সাবানের ফেনার মতন টাকার ফুলে-ওঠা সত্ত্বেও। মনে পড়েছে, কতবার মা-র মুখে শুনেছে: গু আর দুধ পাশা-পাশি রাখলেও কুকুর গু-ই খাবে। কেন? ওটাই প্রবৃত্তি। ঈশানের ভাষায়: গগন গুপ্ত-তুহিন মিত্র-ভোলা মুখোটি আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন। মানে, ঐ গু আর দুধ। অপিচ, সংস্কৃতি প্রগতি নিয়ে কী কপচানি! বগল বাজানোর আওয়াজ মঙ্গল গ্রহ থেকেও শোনা যায়!

—আমার একটা অর্ডার নেবেন ?

—জিষ্ণুর সামনে বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক। জামাকাপড় পরা সকলেই ভদ্রলোক, সেই অর্থে। এঁর বেশ কমলাভোগের মতন নিটোল দেহ। মাথায় টাকের গোল বাটি। গেরুয়া পাঞ্জাবির নিচে সোনার হারের চমক। গলার স্বরে শান্তিনিকেতনী ঢং ও পুঁই ডাঁটার লালার মতন হড়হড়ে ভাব ২ : ৩ অনুপাতে মেশানো !

—বলুন, কী স্বপ্ন আপনি চান।

—আপনাদের লিস্টে দেখছি নাতো, সেজন্যে আর কী—অর্ডার মতন হবে তো ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। নাহলে আপনি নেবেন কেন ? বলুন—

—আমি চাই, মানে—দেখতে চাই—সবাই বেশ ধার্মিক—মানে—

ভদ্রলোককে চমকে দিয়ে, কাঁপিয়েও বলা যায়, ঈশান পাশ থেকে বললো, কোন ধর্মের কথা বলছেন ?

—আজ্ঞে !

—ধার্মিক বলতে কিছু বোঝায় না। খ্রীস্টান এক রকম, মুসলমান অন্য-রকম, বৌদ্ধ আরেক রকম, হিন্দুধার্মিক কতরকম বলাই মুশকিল। এবং এদের কেউই কারুকে ধার্মিক বলে মনে করে না। আপনি কীরকম ধার্মিক হবার কথা বলছেন ?

ভদ্রলোক নিশ্চিত, এমন কূট জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবেন, ভাবেননি। তাঁর করুণ, প্রায় অসহায়, মুখ দেখে জিষ্ণু উগরে-আসা হাসি চাপতে চাপতে ভাবলো, আজই এলে, যখন শানু এসেছে। বোঝো ঠ্যালা, এখন !

ভদ্রলোক কোনোমতে বললেন, কোনো ধর্ম নিয়েই আমি কিছু বলছি না। যে-যার মতন ধার্মিক হোক।

ঈশান বললো, তাহলে এখানে এসেছেন কেন ? ঐ স্বপ্ন তো ফ্রি পাওয়া যায়।

—ফ্রি ? তাই নাকি ? কোথায় ? জানিনাতো !

—যে-কোনো মন্দিরে, মসজিদে বা গীর্জায় চলে যান, পাবেন। কিংবা কোনো বাবা বা মোল্লা বা ফাদারের আখড়ায়। ফ্রি-ই পাবেন। আমরা এসব অর্ডার নিই না। আমরা তো ফ্রি দিতে পারবো না।

কামাখ্যায় একবার একটা হাবা ছেলে দেখেছিলো ঈশান। ছেলেটির চোখের পাতা নড়ত না। তখন ভেবেছিলো, ওর, ছেলেটির, বদন যেন বদনা। ভদ্রলোক ঠিক সেই রকম মুখ করেই চলে গেলেন। ঈশানের ফের মনে হলো, এই মহানগরে কত গাড়ল আছে, তার সত্যি একটা সমীক্ষা হওয়া ভীষণ জরুরি!

মুখে-চাপা রুমাল সরিয়ে জিষ্ণু শব্দ করে হেসে উঠলো। ঈশানও হেসে ফেললো। হাসির যুগলবন্দী চললো তারানার দ্রুত তালে। হাসি থামিয়ে, সিগারেট বাড়িয়ে ও ধরিয়ে, একটু পরে, জিষ্ণু বললো, তোর সেই ইলেকট্রা না কুসুম, এসেছিলো একদিন।

ধোঁয়া ছেড়ে ঈশান বললো—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলো।

—কী নামরে মেয়েটার?

—জানি না। লিখতে রাজী হয়নি। ৪৬ নম্বর নিয়ে গেছে একটা।

৪৬ নম্বর—মানুষকে ভালোবাসা (মাদার টেরেসার মতন)। ব্র্যাকেটের শব্দগুলো ঈশানই জুড়ে দিয়েছিলো। জিষ্ণু চেয়েছিলো, ভালোবাসাই থাক। ঈশান বলেছিলো, শুধু ভালোবাসা রাখলে কেউ বুঝবে না কোন ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে। মাদার টেরেসার ভালোবাসা: 'লাভ ইন এ্যাকশন'। মানুষ ভাববে, ইমোশন ইন মোশন। সেক্স। তাদের জন্য ২৩ নম্বর আছে—চিত্রতারকা/প্রিয় রমণীর সঙ্গে সহবাস। বা ৩১ নম্বর—আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিক/প্রেমিকা লাভ।

কিন্তু ইলেকট্রা কেন ৪৬ নম্বর নিলো? ও কি মাদার টেরেসার ভালোবাসা চায়? কেন চায়? সেই যুবকটির কী হলো? কুসুম, এ তোমার কেমন মন? তুমি তবে জুলিয়েট নও, পার্বতীও নও। কোন বিজনের উদাসিনী তুমি?

জিষ্ণু বললো, জানিস, তোর সেই জুলিয়েট না পার্বতী জিজ্ঞেস করেছিলো, প্যাকেটগুলো নানা রঙের কেন?

—তুই কি বললি?

—প্যাকেটগুলো রঙীন করার আইডিয়া তো তোরই। যা বলেছিলি, তাই বললাম।

মানুষের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা-বাসনা-আর্তির মতন স্বপ্নের রঙও আলাদা আলাদা। কারুর ইস্টম্যানকলার, কারুর ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট। মেট্রোকালার, টেকনিকালার, আগফাকালার, রেনবো, ময়ূরপঙ্খি, শাদা. কালো, ধূসর, পিঙ্গল

—কত রকমই হতে পারে। স্বপ্নের রঙের মতন তাই প্যাকেটের রঙও বিভিন্ন। যে-যেমন খুশি, যার যেমন স্বপ্নের রঙ, বেছে নেবে। রঙটা স্বপ্নের আবরণ। আভরণও।

ঈশান বললো ও নিশ্চয় শাদা নিয়েছিলো।

—কি করে জানলি ?

—সোজা। ৪৬ নম্বর নেবে, ওর মতন মেয়ে, শাদা ছাড়া আর কিছুই মানাতো না।

কলকাতায় সুন্দরী রূপসী মেয়ে বেশি নেই। তেমন সুন্দরী, তেমন রূপসী, উজ্জ্বল ঊষার প্রথম আলোক-সম্পাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন। তার তো কোনো বর্ণনা হয় না। শুধু দেখার। দেখে শব্দহীন আর্তনাদ করার—আমার কেন নেই অর্বুদ নয়ন, কিংবা কোটি বছরের পরমায়ু !

কী ভীষণ গরীব হয়ে গেল কলকাতা ! একটি সুন্দরীর শূন্যতাও কী প্রবল দারিদ্র্যবাহী ! ঈশান দীর্ঘশ্বাস ফেললো। খুবই দীর্ঘ, যাতে কলকাতা বিষন্ন অন্ধকারে ঢাকে।

পরদিন থেকে জায়গা বদল করতেই হলো। বিবাদী বাগ, স্টেটসম্যান স্কোয়ার, গ্র্যাণ্ডের নিচে—একেক দিন একেক জায়গায়। ঈশান বললো, স্বপ্ন-বিপণির কলকাতা-দর্শন, না. কলকাতার স্বপ্নদর্শন।

জিষ্ণু বললো, ঈশান-জিষ্ণুর অর্থ-দর্শন।

বললো বটে, কিন্তু জিষ্ণু জানে ঠিকই, চা-সিগারেট খাওয়া ছাড়া ঈশান একটি পয়সাও নেয়নি। নেয়নি, নেয় না, তবু দর্শন তো হয়ই। অর্থের।

কদিন পরই হৈ-হৈ ঘটে গেল।

একটা ইংরেজি কাগজের 'নোটবুকে' স্বপ্ন-বিপণির খবর দিয়ে মন্তব্য বেরুলো—এ্যালাস ! দে ডু নট সেল পলিটিক্যাল ড্রীম। ক্যালকাটানস্ নোন টু হ্যাভ ইনসেসেন্ট ক্র্যাভিং ফর রেভ্যুলিউশন এ্যাণ্ড সোস্যালিজম্ উইল মিস্ দেয়ার পিস্ অব কেক।

আর কয়েকদিন পরেই, একটি বাংলা কাগজের 'শহর-কড়চা'য় ছড়া-লেখা ফেস্টুনের ছবি সহ ছাপা হলো স্বপ্ন-সমাচার। কড়চা-লেখক লিখলেন—কলকাতায় বাঘের দুধও মেলে, সঠিক মূল্য দিলে—এটা প্রবাদ। কিন্তু স্বপ্ন মেলে, অল্প মূল্যেই। এটা সত্য। স্বপ্ন-বিপণির স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্ন দেখেননি,

এমন অভিযোগ এখনো কেউ করেননি। ইলিশ মাছের জন্য অশ্রু আর লোড-শেডিংয়ের জন্য ঘাম না-ঝরিয়ে ইচ্ছামতন স্বপ্ন কিনে নিলেই পৌঁছে যাবেন, সব পেয়েছির দেশে।

যে-অনেক কারণে কলকাতার হরেক সুনাম ও দুর্নাম, হুজুগে—তার মধ্যে প্রধানই। আর, অধুনা তাই-ই সত্য—যা খবরের কাগজে ছাপা হয়। তো, মাগনা বিজ্ঞাপনের ফলে স্বপ্ন-বিক্রি, সব প্রগ্রেসন থিয়োরি নস্যাৎ করে, হুড়োহুড়ি বেড়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে খাতা-লেখা, হিসেব রাখা, টাকা গোনা মুশকিল ব্যাপার। একা জিষ্ণু পারত না কিছুতেই। ঈশান, কী আশ্চর্য্য অফিসবাবুর মতন নিত্য হাজিরা দিয়ে খাতা লেখে। এমন ধৈর্য, মনোযোগ আর তৎপরতা যেন নেপচুন-প্লুটোয় যাবার কোনো স্পেস-শিপের ড্রইং করছে।

দিন কয়েক কাটতেই হঠাৎ ঈশান বললো, জি, যা ভেবেছিলাম তার কিচ্ছু হলো না। মুভমেন্ট তো দূরের কথা, মানুষ স্বপ্ন দেখতেই শিখলো না। এসব করে কিস্যু হবে না।

জিষ্ণু বললো, তা কেন! মানুষ তো স্বপ্ন নিচ্ছে। প্রচুর নিচ্ছে।

—হ্যাঁ নিচ্ছে। সেগুলো কী স্বপ্ন? আমি হিসেব করে দেখেছি, এখন পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে—এই খাতার রেকর্ড অনুযায়ী—৩১৩০৯টি স্বপ্ন। এর ৯৮.৩৭% তোর সেই সব ভুষিমাল। ৪৭টা স্ট্যাণ্ডার্ড স্বপ্নের মধ্যে ২৩—টা সব ভুষি—নিয়েছে ৭৮% মানুষ। ৮টা নিয়েছে ১৩%, ১১টা নিয়েছে ৭% লোক। ৩টে স্বপ্ন নিয়েছে বাকিরা—যার বেশি ভাগই জোর করে গছানো। ২টো স্বপ্ন এখনো পর্যন্ত কেউই নেয়নি।

জিষ্ণু বললো, জানি। ৯ আর ৪১।

৯ নম্বর—জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত কোনোরকম কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস আর নেই।

৪১ নম্বর—মানুষ মানুষকে কোনো কারণেই (যুদ্ধ, দাঙ্গা, অর্থ, নারী, রাজনীতি, ধর্ম) হত্যা বা নিপীড়ন করে না।

ঈশান বলে, ৪৬ নম্বর নিয়েছে ইলেকট্রাসহ তিনজন। এবং ভাবতে পারিস ২৭ নম্বর—কলকাতা সত্যিই কল্লোলিনী তিলোত্তমা—নিয়েছে মাত্র ৭ জন! অথচ ২৩ নম্বর নিয়েছে ১৬৫৭ জন, আর ৩১ নম্বর নিয়েছে ২৭২৮ জন। চাকরি-বাড়ি-টাকা-সম্পত্তি একসঙ্গে যোগ করলে ২৫ হাজারেরও বেশি হবে। ঘেন্না ধরে গেল মাইরি! নিজের শহরকে ভালোবাসে না, মানুষকে ভালো-

বাসে না, সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে চায় না—এ-কোন অরণ্যে আছি আমরা ?

সিগারেটের মহৎ গুণ, বিনা প্রতিবাদে জ্বলে। ধোঁয়ার উপকারিতা, ভেতরের বাষ্প নিঃশেষে বের করে দেয়। জিষ্ণু গভীর চোখে ঈশানের মুখের জ্বলন্ত আভা, দেশলাই কাঠির মতন, নিভে যেতে দেখলো। বুকের ভেতরে ফুলে-ওঠা শ্বাস চেপে, সিগারেটের সঙ্গে নিজের অন্তর্গত তাপও নিভিয়ে বললো, কী করবি তবে ?

ঈশান বললো, ভাবছি। তোর ২৩ প্লাস ৮, ৩১টা স্বপ্ন—সব ভুষিগুলো—নো-স্টক করে দে। তারপর দেখি কী দাঁড়ায় !

একটু থেমে আবার বললো, খালি প্যাকেটগুলো নিয়ে আয় দেখি। আমি যেমন-যেমন বলবো, ভরে যাবি।

প্যাকেট ভরতে-ভরতে জিষ্ণু ম্লান মুখে বললো, শান্নু, ব্যবসার যে টুয়েলভ-ও ক্লক হয়ে যাবে।

নির্বিকার, ভারি স্বরে ঈশান বললো, হোক। আই ডোন্ট কেয়ার।

পরদিন ঈশান নিজেই নিলো বিক্রির দায়িত্ব। জিষ্ণুর কাজ—খাতা লেখা আর টাকা গোনা। ৩১টা স্বপ্ন নেই। বাকি ১৬টা স্বপ্নের খদ্দের নেই। ঈশান নানা কায়দায় মানুষকে পছাতে লাগলো।

কেউ ২৩ নম্বর চাইলেই বলেছে—ওটা তো নেই। ১ নম্বর নিয়ে যান। অত বড়ো একটা কাজ করার আগে নিজের ম্যানহুডটা যাচাই করে নিন।

৩১ নম্বর চাইলে বলেছে—৪৬ নম্বর নিয়ে যান। লাভ বিগেটস লাভ। লাভও প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ট্রাই করে দেখুন। প্লেটনিকভাবেই তো শুরু করতে হয়।

এভাবেই গছিয়েছে ৯ নম্বর, ৪৬ নম্বর এবং বাকিগুলো। খুব বেশি পারার কথা তো নেই। গাঁটগচ্চা দিয়ে কেউ নরুন কেনে না আজকাল। তেমন নিপাট গাড়ল কলকাতায়ও বিশেষ নেই।

জিষ্ণু হাই তুলতে-তুলতে টাকা গোনে, খাতা লেখে। টাকার সঙ্গে হাইয়ের অনুপাত ঠিক রাখতে সিগারেট পোড়ায় তিনগুণ। নিজের ব্যবসা পুড়িয়ে, সেই আগুনে অন্যের ব্যবসার—সিগারেটের—গোলায় ধুনো দেবার বিষয়ে জিষ্ণু একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। অথচ ঈশানের কপালে একটা রেখাও বেশি পড়লো না। নিষ্ঠাসহকারে ভারখায়নক্সে বরফ বিক্রির চেষ্টায় ওর ক্লান্তি নেই।

হাজী সাহেবের কাছে গীতা, তর্করত্ন পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে কোরাণ বিক্রি করতে ঈশানই পারে।

দিন চারেক পরে, সকাল দশটা নাগাদ ফেস্টুন ঝুলিয়ে জিপিওর সামনে দাঁড়াতেই মালুম হলো জনগণমন কী জিনিষ!

প্রথমেই একজন বছর পঁচিশের যুবা এসে বললো—না, একে বলা বলে না, গর্জন কথাটাই সঙ্গত—এই যে, ভেবেছেন কী? পয়সা নিয়ে যা-খুশি করবেন?

শান্ত গলায় তরল হাসি মিশিয়ে ঈশান বললো, রাগ করছেন কেন! কী হয়েছে বলবেন তো! স্বপ্ন দেখেননি?

—স্বপ্ন? একে স্বপ্ন বলে? সারারাত ঘুমোতে পারিনি। এখনো ভাবলে মাথা ঘুরে উঠছে। আপনি বলছেন রাগ করবো না!

গলায় এত জোর—রেশনের চালের অবদান হতে পারে না। চেঁচামেচি-উত্তেজনা মানেই মজা। সকাল দশটায় জিপিওর সামনে মাগনা মজা। চিটে গুড়ে পিঁপড়ে খুব খারাপ উপমা।

—কী হয়েছে, দাদা? কী হয়েছে?

—আরে মোসাই, ব্যাপারটা কী?

তেজী গলা জীবনে কখনো এত শ্রোতা পায়নি। নিজেকে জ্যোতি বসু ভেবে সজোরে বললো, নগদ পয়সা দিয়ে ঐ এক নম্বর স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম—তা-ও আমি চাইনি, ইনি জোর করে গছিয়েছিলেন—কী না নিজেকে একজন মানুষ, ইচ্ছামতন মানুষ হবার স্বপ্ন দেখবো।

—তো, কি হলো? দেখেননি?—ভিড়ের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো।

—দেখবো না কেন! কিন্তু, সে কী মানুষ? এই দেখি গাড়ি চড়ে অফিসে যাচ্ছি, এই দেখি কঙ্কাল। তারপরই দেখি রাস্তার মধ্যে রক্তের সমুদ্রে ডুবে আছি। আবার দেখি, থানায় নিয়ে পুলিশ বেধড়ক ধোলাই দিচ্ছে। কত আর বলবো, মশাই—

—আমারও হয়েছে—আমারও। ভিড় ঠেলে, তুখোড় সেন্টার ফরোয়ার্ডের মতন, এগিয়ে এলেন আরেকজন। বছর পঞ্চাশের মোটাসোটা মানুষ, গেরুয়া খাদির পাঞ্জাবি গায়ে—আমাকে মশাই ৯ নম্বর দিয়েছিলো। তারপর কী কেলেঙ্কারি সে আর কী বলবো আপনাদের। দেখি কি, জাতধর্ম বলে মানুষের

আর কিছু নেই। মন্দিরের মধ্যে নেড়েরা বসে আছে, মসজিদে যজ্ঞ করছে ব্রাহ্মণ, হিন্দু বিয়ে করছে মুসলমান, তারা করছে খ্রীস্টান। ব্রাহ্মণ বিধবার বিয়ে হচ্ছে মুচি-মেথরের সঙ্গে—কত বলবো—সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা—আমার আবার হার্টের ব্যামো—

একই সঙ্গে কয়েক শত খেঁকি কুকুর, শেয়াল, কাক, হুলো বেড়াল, গাধা, হায়না, চড়ুই জেট-ইঞ্জিনের মতন চেঁচালে কিছু শুনবে, বুঝবে, মানুষের কানে তেমন কোনো ইলেকট্রনিক ছাঁকনি নেই। জিষ্ণু ঈশান প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পারলো না। ঈশান বার কয়েক বলার চেষ্টা করলো, স্বপ্ন-দেখাটা দ্রষ্টার নিজের ওপর নির্ভর করে। তিনি পছন্দের বিষয়টি সম্পর্কে যেমন ভাববেন, এক মিনিট সময়, স্বপ্ন ঠিক তেমনই দেখবেন। বিক্রির সময় একথা বলা হয়, প্যাকেটের ভেতরে নিয়মাবলীতেও সে-কথা লেখা আছে। আমরা আইডিয়াটা বেচি, বিষয়বস্তু বেচি না। সেটা ক্রেতার নিজস্ব চিন্তার ফসল। উই গিভ য়ু দ্য আইডিয়া—নট দ্য অবজেক্ট—যে-কোনো স্বপ্নের গোড়ার কথাই তো তাই। সুতরাং—

জনগণের এসব যুক্তিসিদ্ধ কথা শোনার কোনো দায়ই নেই। অগত্যা নিষ্ফল চেষ্টা ছেড়ে দুই বন্ধু নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে শুনলো—

—আমি দেখি, রাস্তায় একটু পিক ফেলেছি ড্রেনের মধ্যেই—আমার ১০০ টাকা জরিমানা হয়ে গেল—

—আমার কি হলো জানেন? আমার বোনকে (ডাহা মিথ্যা, আরেক-জনের স্ত্রী) নিয়ে যাচ্ছে দেখে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছি আর একটা লোক (ঐ স্ত্রীর স্বামী) আমাকে মেরে থানায় নিয়ে গেল—আর পুলিশ আমাকে লক-আপে-পুরে—

—এ আর কি হয়েছে। আমি দেখি কুষ্ঠ রোগীর ভিড়ের মধ্যে আমি একলা ওদের গু-মুত-ঘা-পুঁজ পরিষ্কার করছি। তারপর একটা বেশ্যা এসে আমার কোলে একটা কচি বাচ্চা দিয়ে—

—এই দেখছি আমি সাত ফুট লম্বা, তারপরেই আবার বামনের মতন তিনফুটি। এই দেখছি আমার বিরাট ভুঁড়ি, পরমুহূর্তেই দেখি এ্যাথলেটের শরীর। এই দেখছি বোর্ডের মিটিংয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি তারপরই দেখি সুইপার হয়ে গেছি। সে কী কাণ্ড—আমার স্ত্রী তো মদ খেয়েছি ভেবে যাচ্ছেতাই-ভাবে—

—শিয়ালদায় নেমে কলকাতা আর চিনতে পারি না! সব যেন কী রকম অচেনা। তেষ্টা পাওয়ায় একটা ডাব খেয়ে মাত্র খালি ডাবটা ফেলেছি, আর পুলিশ আমাকে সোজা থানায় নিয়ে—

হঠাৎ কখন যে ভিড়টা হিংস্র রক্তপায়ীর মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো ঈশান বা জিষ্ণু বুঝতেই পারলো না। চোখের ওপরে প্রথমে একটা লাল, গাঢ়, উষ্ণ ঢেউ ভেঙে পড়তে না পড়তেই এক বিপুল কালো অন্ধকার সমুদ্রের অতলে ডুবে যাওয়ার আগে কেবল শুনেছিলো—

—মারো—মারো—মারো শালাদের—

—ভেবেছে কি শালারা—আমাদের যা-খুশি স্বপ্ন দেখাবে—

জামাকাপড় পরা সকলে। সুতরাং ভদ্রলোক। অকাতরে এমন সব শব্দের উদ্গার হলো, যা এ-দেশে, এখনো, লেখা বা ছাপানো দণ্ডনীয়।

সেদিনই সন্ধ্যায় আকাশবাণীর খবরে বলা হলো: এক দৃষ্টি-আকর্ষণী প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লোকসভায় জানিয়েছেন, আজ বেলা দশটার কিছু পরে, জনগণের মধ্যে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, ধর্মবোধ, নৈতিকতা ও সংস্কৃতি-বিরোধী স্বপ্ন-দেখার প্ররোচনা দেবার অভিযোগে কলকাতায় দুজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের আশ্বস্ত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, এর পেছনে কোনো বৈদেশিক শক্তির গোপন ষড়যন্ত্র আছে কিনা সে-বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই একটি বিশেষ বিবৃতি দেবেন।

এই অন্ধকারে

খেলার আসরে

রাত আটটা। ওরা তাস খেলছে। ফ্লাশ। ওরা—মন্টু, বিলু, বাঘা, টিপু আর মণি। পাঁচ বন্ধুরই বয়েস বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। ফ্লাশ। সঙ্গে হুইস্কি।

তাস বাটছিলো বাঘা। বাটা শেষ করে প্যাকেট থেকে দামি আমেরিকান সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝোলায়। বোর্ডে পয়সা ছুঁড়ে কাউকে উদ্দেশ না-করেই বললো—আগুন।

ওদের একটু পিছনে, বাঘা, আর মণির মাঝখানে বসেছিল মিন্নু। পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে বাঘার হাতে তুলে দিল।

বাঘা ক্রুদ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধভাবে সিগারেট ধরিয়ে দিয়াশলাই ফেরত দেয়। ওর মেজাজ খুব খারাপ। প্রচুর হারছে। ছ'ঘন্টা খেলে এই প্রথম বোর্ড পেলো। তাও সামান্য টাকার।

এতক্ষণ খেলা হলো, তবু জমছে না। উত্তেজনাহীন—প্রায় নিস্তেজ খেলা। এমন সাধারণত হয় না। দারুণ উত্তেজনা, হৈ-হুল্লোড় এবং খুশির উল্লাসে সরগরম থাকে আসর। যে-হারে তারও উল্লাস কম হবার কারণ নেই। খেলায় হারজিত থাকে। জীবন মানেই জুয়া। খেলায় উত্তেজনা না-থাকার অর্থ বিধবার আয়ুস্খালন।

তবু, খেলা জমছে না আজ। উত্তেজনার তুবড়ি ফাটছে না। রোজকার মতন বেলেল্লা খিস্তির কীর্তন গাইছে না বাঘা। পাড়া কাঁপানো হাসিতে চিৎকারে ফেটে পড়ছে না কেউ। সারা আসর যেন মধ্যরাতের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মতন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে।

মিন্নু চুপচাপ আজকের আসরের এই আকস্মিক প্রাণহীনতার কারণ

ভাবছিলো। হলো কি ছেলেগুলোর! মিনু নিজে কখনো তাস খেলে না। মদ স্পর্শও করে না। ওদের মধ্যে মিনু একেবারেই বেমানান। স্কুলজীবনের বন্ধু মণির টানে ওকে আসতেই হয়। না-এসে পারে না। যুবক হো-চি-মিনের মতন মিনুর মুখে সারাক্ষণ এক করুণামিশ্রিত কৌতুকের হাসি আলতোভাবে ঝুলে থাকে। সস্তার সিগারেট ধরিয়ে ও চুপচাপ রগড় দেখে।

কিন্তু আজকের রগড়ে কোনো ঝাঁঝ নেই। সবাই খেলার আসরে আছে ঠিক, অথচ পাঁচজনেরই মাথার মধ্যে ট্রেনছুট দৃশ্য-দৃশ্যান্তর মাঝেমাঝেই ওদের অন্যমন করে দিচ্ছে।

মন্টুর মুখ

লং-শটে ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা ছবিটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। ক্লোজ-আপ—আরো ক্লোজ—আরো—পুরো পর্দা জুড়ে একটা মুখ। তীক্ষ্ণ তীব্র আবহ-সঙ্গীতে একটা উচ্চারণ বারবার, বারবার—ঐযে! ঐযে! ঐযে!

মন্টুর নাভিকুণ্ডলী থেকে আর্তনাদ উঠে আসে না-আ-আ! গলার কাছে এসেই থেমে যায়! কিড়মিড় দাঁতের মধ্যে হাড়ের টুকরোর মতন আটকে থাকে শব্দ—শালা হারামী!

তারপরেই ফ্ল্যাশব্যাক।

সকালে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলো মন্টু। আরেক বন্ধুকে নিয়ে। বন্ধুর মামা যাবেন ব্যাঙ্কক। মামাকে বিদায় দিয়ে বেরিয়ে আসবে এমন সময় কাস্টমস গেটের বাইরে আচমকা একটা সোরগোল উঠলো। বন্ধুসহ মন্টু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায়! দেখে তিনজন মাঝবয়েসী লোক অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করছে। ওদের দেখলেই বোঝা যায় সদ্য লণ্ডন থেকে এসেছে। এপ্রিলের গরমেও থ্রী-পিস স্যুট, হাতে ছাতা, পায়ে ঝকঝকে নতুন জুতো, গলায় সরব থ্রী-ব্যাণ্ড ট্র্যানজিসটার ঝুলছে। সঙ্গে একগাদা মালপত্র। এরা লণ্ডনে হোটেলবয় বা কুক হিসেবে কাজ করে। কিংবা হয়তো সীম্যান। বছরে এক-আধবার দেশে এসে ঘুরে যায়। জমানো টাকার দাপটে ও নানা বিলাসদ্রব্য দেখিয়ে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর বুকে রাবণের চিতা জ্বালিয়ে ফিরে যায়। এদের মন্টু অনেক দেখেছে।

যে-লোকটির বয়েস একটু বেশি—চুলে গোঁফে সাদা রেখা—সেই প্রাণপণে চিৎকার করছিল। ওর গলার দুপাশের রগ নীল হয়ে দপদপ করে—শালা,

হারামির বাচ্চা! খানকির পুত! তোর বোয়েরে-দাইয়া টাকা রোজগার কর। আমাগো পোঁদে লাগা ক্যান?

সঙ্গের লোক দুটিও অনুরূপ ভাষায় মন্তব্য করছিল। ওদের ঘিরে একটা ছোট ভিড়। কিছু লোক প্রাণখুলে হাসে, যেন দারুণ মজার ব্যাপার। কয়েকজন চুপচাপ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। বাচ্চারা যেমন কাঠির আইসক্রীমের ঝুলন্ত রস সরসর শব্দে শুষে নেবার চেষ্টা করে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করে—কী হয়েছে, এমন আজেবাজে বকছেন কেন?

বুড়োমতো লোকটা খেঁকিয়ে ওঠে—আজে বাজে বকত্তাছি আমরা? আমাগো সব লুইট্যা নিছে— অ্যাত কষ্টের টাকা …… ইত্যাদি ইত্যাদি। মড়া-কান্নার সুরে লোকটা লম্বা ফিরিস্তি দিতে থাকে।

ধীরে ধীরে বোঝা গেল, ওদের কাছ থেকে বেশ কিছু পাউণ্ড, কাপড়, কসমেটিক্স, সিগারেট কাস্টমস কেড়ে রেখেছে। কোনো রশিদ দেয়নি। রশিদ দিলে ওরা নাহয় ডিউটি জমা দিয়ে সব ছাড়িয়ে নিতে পারত। কোনো কাগজপত্র না-দেবার মানেই হল, কাস্টমসের লোকেরা নিজেরাই সব মেরে দিয়েছে।

মন্টু চুপচাপ শুনছিল সব। ওর মনে হয় লোকগুলোর প্রতি ঘোর অন্যায় করা হয়েছে। তরুণ মনে প্রতিবাদস্পৃহা ও প্রতিকার-ইচ্ছা স-আবেগ জেগে ওঠে। ও বললো, কে নিয়েছে দেখাতে পারবেন?

—হ্যাঁ, পারব।

—চলুন আমার সঙ্গে। লোকটাকে দেখিয়ে দেবেন।

হঠাৎ ভিড়ের থেকে একজন বলে উঠল—কেন মিছিমিছি ঝামেলায় যাচ্ছেন? এ এখানে হামেশা হচ্ছে। কারুকে বলে কিচ্ছু করতে পারবেন না। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে এরা চলে যাবে। আপনি নাহক ফাঁপরে পড়বেন।

কথাগুলো শুনে মন্টুর জেদ আরো বেড়ে যায়। বলে—কেউ কিছু বলে না বলেই ওদের সাহস বেড়ে গেছে। প্রতিবাদ না করলে আরো বাড়বে।

লোকটাকে নিয়ে মন্টু কাস্টমস গেটের দিকে এগিয়ে গেল। কাস্টমস-সীমানার ওধারে একজন দীর্ঘকায় অফিসার তখন বাইরের গেটের দিকে পিছন করে শিস দিতে দিতে চলে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে আরো দুজন ইউনিফর্ম পরা কাস্টমস অফিসার। ওদের দেখেই মন্টুর সঙ্গের লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে—ঐষে

ঐ-মাঝখানের লম্বা মোটা লোকটা।

মন্টুর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভেতর থেকে বলে ওঠে, লোকটা ঠিকই বলছে। তবু নিশ্চিত হবার জন্য বললো, আপনি ঠিক জানেন মাঝখানের জনই নিয়েছে?

লোকটা আঙুল বাড়িয়ে নির্দিষ্ট করে সজোরে বললো, ঠিক জানি মানে! ঐ লোকটাই নিছে। বেবাক পাউণ্ড—পুরা বাক্স সিগারেট—কাপড়—

নিশ্চুপ, নিশ্চল হয়ে গেল মন্টু। বুকের ভেতর থেকে এক অবিশ্বাসের যন্ত্রণা জলোচ্ছাসের মতন ফুলে উঠে মস্তিষ্কের কোষে কোষে ধাক্কা মারল। সর্পিল একটা অনুচ্চারিত আর্তনাদ দাপাদাপি করে—বাবা! তুমি এই রকম!

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বন্ধুকে জোর করে টেনে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসে মন্টু। পিছনে বুড়ো লোকটা চেঁচায়—কী হইল বাবু, একটা বিহিত করবেন না—ও বাবু—

মাথার তালুতে জলন্ত অঙ্গার নিয়ে নিজের ঘরে বসে থাকে মন্টু। সময় গড়িয়ে গড়িয়ে দুপুর। বাবা আসার শব্দ হয়। টুকরো টুকরো সংলাপের স্বর ভেসে আসে।

মার প্রতি ছুঁড়ে মারা বক্রোক্তি হঠাৎ কান ধরে টানে—তোমার নবাবপুত্তুর কোথায়? ঘরে, না রাজ্য জয় করতে বেরিয়েছেন!

বি-এস-সি পাশ করার পর থেকেই এমন বক্রোক্তি মাঝে মাঝে শুনতে হয়। ইচ্ছে ছিল এম-এস-সি পড়বে। অধ্যাপনা করবে। বিজ্ঞান-গবেষণায় জীবন কাটাবে। বাবার পছন্দ হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন, কোনো একটা সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়ুক। কাস্টমসে হলে ভালোই হয়। অফিসার হয়ে ঢুকতে পারলে কমিশনার কি তারও উঁচুতে উঠতে পারবে। উজানি মাছের মতন টাকা আসবে অঢেল। চাকরি টাকার জন্য। টাকাই জীবন। মন্টু রাজি হয়নি বাবার পথে যেতে। সে-জন্য পড়াশুনা বন্ধ রেখে বাবার সঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধ আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দিন কাটায়।

এখন বাবার কথা শুনে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মন্টু। বাবা এতক্ষণে বাইরের পোশাক ছেড়ে ঘরোয়া পোশাকে হালকা হয়ে বসেছেন পাখার নিচে।

মন্টু সামনে দাঁড়িয়ে বললো—আমি কোথায় তা নিয়ে এত চেঁচাবার কী হল?

—ঘরে আছিস কিনা জিজ্ঞেস করাটা চেঁচানো হল? নিজের বাড়িতেও গলায় সাইলেন্সর লাগিয়ে থাকতে হবে নাকি।

—লাগালে ভালো হয়। গলায় সাইলেন্সর, চোখে ঠুলি আর কানে কপাট।

—তার মানে? বাবা অবাক চোখে তাকান।

মন্টু হঠাৎ বলে—মানে বোঝার দরকার নেই। একশ টাকা দেখি।

—একশ টাকা!—বিস্মিত বাবা বলেন, এত টাকা কী করবি?

—তা জেনে কী দরকার! টাকাটা দেখি।—প্রায় হুকুমের সুরে বলে মন্টু।

বাবা ফেটে পড়েন—টাকা গাছে ধরে হারামজাদা? হুকুম করলেই বেরিয়ে আসবে!

মন্টুর চোখে শাণিত বিদ্যুৎ খেলে যায়। ঠোঁট ছুঁচোলো করে বলে, হারামের টাকা হারামের গাছেই ধরে নিশ্চয়! আর হারামির ছেলে তো হারামজাদা হবেই।

—কী, কী বললি তুই? আমাকে হারামি বললি?—কাতর চিৎকারে ভেঙে পড়েন বাবা। রান্নাঘর থেকে মা ছুটে আসেন।

মন্টুর মাথার মধ্যে সাপের জিভের মতন আগুন লকলক করে—কেন, অন্যায় বললাম কিছু? কতগুলো পাউণ্ড হাতিয়েছ আজ লণ্ডন প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে? কোথায় পেয়েছ ঐ দামি সিগারেটের কার্টন, ঐ প্যাকেটের কাপড়? —টেবিলের ওপর রাখা জিনিসগুলোর দিকে আঙুল দেখায় মন্টু।—এগুলো যদি হারামের না হয়, তবে হারাম কাকে বলে?

মা বলেন—মন্টু! চুপ কর, চুপ কর। কী যা তা বলছিস তুই!

বুকের কাছে ছুটে আসা মাকে আলতো ভাবে সরিয়ে মন্টু বললো, তুমি চুপ করো মা। এসব তুমি বুঝবে না।

এই সুযোগে বাবা বলেন—কে বলেছে তোকে এসব?

—কেউ বলেনি। আমি নিজে জেনেছি। আগেও শুনতাম, এসব হয়। বিশ্বাস করিনি। তুমি বুঝিয়েছিলে, বাইরে থেকে সস্তায় আনাও—ডিউটি-ফ্রি। আজ জেনেছি সবটাই ফ্রি—ফুলফ্রি! লুঠের মাল। আর আমাকে খালি জ্ঞান দাও সৎ হও, ভালো হও, বখামি করো না—ছিঃ।

মা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন বুকের ওপর—মন্টু!

বাবা চিৎকার করেন—বেরো—বেরো তুই আমার বাড়ি থেকে—

আরো জোরে চেঁচায় মন্টু—বেরোবো তো বটেই! কিন্তু আমার ঘেন্না করছে ভাবতে যে ঐ হারামের পয়সায় এতদিন খেয়েছি, পরেছি। লুঠের টাকায় পড়েছি। এখন বুঝতে পারছি কেন আমাকেও কাস্টমসে ঢোকাতে চেয়েছ। আমাকেও লুঠেরা বানাতে চেয়েছিলে। হারামির বাচ্চা হারামি! থু থু—

একদলা থুথু ছিটিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন বেরিয়ে যায় মন্টু।

সারাদিন এই স্মৃতির রীল অটোমেটিক গতিতে মাথার মধ্যে ঘোরে। বারবার, বারবার। কপালের দুপাশের শিরাগুলো লাফায়।

একেকবার মিনুর কথা মনে পড়ে। মিনু একদিন বলেছিল দুর্নীতি দুর্নীতি বলে চিৎকার করে কোনো লাভ নেই। এক আধজনকে দায়ী করে শৌখিন শাস্তি দেওয়াটা একেবারে অর্থহীন। পুরো বাড়িটার ভিতশুদ্ধ সবটাই পচে গেলে কেবল জানলা দরজা বদলে কী হবে? সবটাই নতুন করে গড়া দরকার, একেবারে নতুন করে।

মিনু বরাবরই বড়োবড়ো কথা বলে। আড়ালে মিনুকে ওরা 'জ্ঞানদা' বলে ডাকে। বাঘা এই নাম দিয়েছে।

জ্ঞানদার কথাগুলো ভেবে একেকবার মন্টুর মনে হচ্ছিল, তাহলে বোধ হয় বাবারও কোনো একটা বক্তব্য আছে—একতরফা বিচার করাটা বোধ হয় অনুচিত হল!

মনটা একটু নরম হয়ে আসতেই ছবির রীলটা ঘুরে যায়। পর্দা জুড়ে ফ্রিজ শট—একটা বিরাট মুখ। সঙ্গে শব্দ—ঐ যে! ঐ যে! ঐ যে!

তীব্র বিতৃষ্ণা ভরা মুখে গ্লাসের দিকে হাত বাড়ায় মন্টু। গলার কাছে একটা উচ্চারণ মুচড়ে ওঠে—হারামি!

বিলুর ছবি

দুটো সুন্দর চোখ। স্বপ্নময়। ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়। চোখের নিচের চামড়ায় সংখ্যাহীন দাড়ি, জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধের চিহ্ন। তার ওপরে সুপার-ইমপোজ করা একটা দৃশ্য।

বিস্রস্ত বসনের একটি নারীকে বগলে জাপটে চাঁদির ওপর নিটোল বৃত্ত আঁকা

এক পৃথুল পুরুষ শ্লথপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। নারীর বয়েস হঠাৎ দেখলে আঠাশ তিরিশ মনে হতে পারে, আসলে বিয়াল্লিশ। বে-হাত ব্লাউজের নিচে মাখনের স্তূপ চিজের বলের আকৃতিতে ধরা। মুখের সুচারু দীপ্তি এখনো উজ্জ্বল। সঙ্গী পুরুষের বয়েস ঠিকানা-খোঁজা মানুষের মতন পঞ্চাশের দরজায় ঘোরাঘুরি করছে। জুলপিহীন অ্যালকোহলিক ঝুলন্ত গালে লিপস্টিকের ইতস্তত শিল্প। নারীকে জড়ানো ডান হাত ক্ষণে ক্ষণে চিজের বলের হদিশ নেয়।

পরম পরিতৃপ্ত কণ্ঠে সংলাপ বাজে—তোমার জবাব নেই!

নারী কণ্ঠে চতুর্দশী সলাজ কিশোরী বলে, য়ু নটি!

পুরুষটির ঠোঁট নারীর রংশূন্য গালে সরসর শব্দ তোলে—সত্যি বলছি। উম্‌ম্‌—বিশ্বাস করো উম্‌ম্‌—কে বলবে তুমি উম্‌ম মেডেন নও—ফ্রেশ লাইক আ লিলি! রিয়েলি!

দরজার কাছে এসে নিতান্ত অনিচ্ছায় পুরুষটি হাতের বন্ধন থেকে নারীকে মুক্তি দেয়। দুঃখভেজা স্বরে বলে—চলি তাহলে আজ। আবার কবে আসব? ফোন করব, হ্যাঁ!

যাবার জন্য পা বাড়িয়ে, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে যেন, এইভাবে বলল, হাজব্যাণ্ডকে বলো, চিন্তার কিছু নেই। হি উইল গেট হোয়াট হি ওয়ান্টস্‌।

•

সুপার-ইম্পোজড দৃশ্যটা মিলিয়ে যায়। চোখ দুটোকে ঘিরে একটা মুখ—যন্ত্রণায় বিদীর্ণ। ঝাঁঝালো সাইরেনের শব্দ মস্তিষ্কের কোষে কোষে। শরীরের সব রক্ত একযোগে ছুটে আসে মুখে।

কয়েক পা এগিয়ে নারীটির মুখোমুখি দাঁড়ায় বিলু।

আচমকা বিলুকে দেখে নারী নিশ্চল স্তব্ধতায় স্থির। দ্রুতহাতে পোষাক ঠিক করে। মুখটা দুহাতে ঘষে চোখ রগড়ে নেয়। স্খলিত উচ্চারণ ক্ষণপূর্বে দলিত রক্তিম ঠোঁট বেয়ে গলে আসে—বিলু, তুই!

বিলুর চোখের দিকে তাকিয়ে নারীর সমস্ত অস্তিত্ব তীব্র শীতার্ত অনুভবে কেঁপে ওঠে। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে দুচোখ ঘোলাটে হয়ে যায়।

—লোকটা কে?—বিলুর নির্মম শাণিত স্বর ছুরির ফলার মত ছোটে।

—বিলু—ইয়ে—তুই কখন এসেছিস? আমাকে ডাকিসনি কেন?—অস্থিরভাবে শব্দ খোঁজে নারী।

—আমি এসেছি অনেকক্ষণ। লোকটা কে?—একই রকম নির্দয় স্বর।

অসহায় বিহ্বলতার মধ্যেও সহজ হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে নারী—উনি! উনি তোর বাবার মিনিস্ট্রির সেক্রেটারি।

—এ সময়ে কেন এসেছিলেন এখানে?

... ...

—কেন এসেছিলেন?—বিলু চিৎকার করে।

নারী ব্যাকুলভাবে কথা খোঁজে। পায়ের জোর হারিয়ে গেছে। ঘরের মেঝেটা বুঝি কাঁপছে। হাত বাড়িয়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়ায়।

—কেন এসেছিলেন উনি?

—উনি কী কাজে যেন—এদিকে এসেছিলেন—তাই, তাই দেখা করে গেলেন। ...বিলু, তুই খেয়েছিস?

—শাট আপ্।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে ফট করে শব্দ হয়। বিলুর চোখে ভেসে ওঠে একটা ছবি।

মাস কয়েক আগে বিলুর এম-এ পাশ ও জন্মদিন উপলক্ষে খুব হৈচৈ করা হয়েছিল। সেই উৎসবে মন্টু, বাঘা ওরাও সবাই এসেছিল। মার সঙ্গে বাঘাকে পরিচয় করিয়ে দেবার পর, পরিষ্কার মনে আছে, বাঘা বলেছিল, উনি তোর মা! তোর নিজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে তুই বলছিস, নইলে বিশ্বাস করতাম না।—অস্ফুট একটা চকচক শব্দ বেজেছিল বাঘার গলায়। চোখের দৃষ্টিতে সারাক্ষণ যে রঙ ভাসে তা মোটেই বন্ধুর জননীর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও সমীহের দূরতম আত্মীয়ও নয়।

বিলু হালকাস্বরে বলেছিল, শাট আপ।

আজ আবার বললো, এবার মাকে। কতবার কতজনকে শাট আপ বলবে? বললেই কি বন্ধ হবে, না বন্ধ হবার?

অন্যমনস্কতা থেকে ফিরে আসে বিলু। মা বলে যাচ্ছেন—ওঁর হাতেই তোর বাবার প্রমোশন। কবে থেকে আটকে আছে! আর হ্যাঁ—উনি বলছিলেন তুই যেন এবার পরীক্ষা দিস—তোকে ফরেন সার্ভিসে নিয়ে নেবেন।

পৃথিবীর সমস্ত ঘৃণা নিয়ে বিলু চোখ ফেলে মার মুখে—শুধু বাবার প্রমোশনই না, আবার আমার চাকরিও—তাও ফরেন সার্ভিসে! বাঃ, খেলাটা তো জব্বর লাগিয়েছ!

একটু থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে আবার বলে—তা তার বিনিময়ে আমার

বউকেও ঐ ডিবচটার সঙ্গে শুতে দিতে হবে তো?

—বিলু!—আর্তনাদ করেন মা। ঝরঝর ঝরে জমানো অশ্রু। অন্তর্গত যন্ত্রণায় শরীর কাঁপে—বিলু আমি তোর মা! তোর বাবা জানেন তাঁর—

—থামো!—বিলু গর্জন করে—বাবা কী জানেন আমি শুনতে চাই না। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে, যাকে আমি বাবা বলে জানি আসলে তিনিই আমার বাবা কিনা।

নিপুণ গোলরক্ষকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন মা। বিলুর মুখে হাত চেপে বলেন—বলিস না, বিলু, বলিস না। এমন কথা বলিস না বিলু!

এক ঝটকায় নিজেকে আলগা করে নেয় বিলু—ছুঁয়োনা আমাকে—ছুঁয়োনা! আমার ঘেন্না হয় ভাবতে তুমি আমার মা!

আত্মধিক্কারের কালো ছায়া আস্তে আস্তে বিলুর সারা বুক ঢেকে ফেলে। টেলিপ্রিন্টারের শব্দের মতন কাঁপতে থাকে ঠোঁট। একা হা-হা রব অনুভবের অণুতে অণুতে ছড়ায়।

ক'বছর আগেও এই মার বুকে মুখ রেখে ভাবতো জীবনে আর কোনো কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই। এর চেয়ে শ্রেয়তর কোনো শান্তির আশ্রয় নেই জগতে। আদর করে গালে মা ঠোঁট ছোঁয়ালেই মনে হতো পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়ার গ্লানি, খেলার মাঠে পাওয়া চোট সব যেন ব্লটিং পেপারের মতন শুষে নিয়েছেন মা। সেই বুকে, সেই ঠোঁটে একটু আগে এক চতুর লম্পট—

আর ভাবনা খেলে না মাথায়। রক্ত প্রবাহ উদ্দাম ছোটে মাথার মধ্যে। চুলের প্রতিটি গোছায় আগ্নেয় উত্তাপ।

উদ্‌ভ্রান্ত, ভাঙা কাঁপা গলায় চিৎকার করতে করতে বাইরে ছোটে বিলু—আই হেট য়ু—আই হেট য়ু অল্—আই হেট মাইসেলফ—

সেই দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছে বিলু। অনেকবার ভেবেছে আত্মহত্যা করে। আবার ভেবেছে, খুন করে ঐ লম্পট লোকটাকে। পরে নিজেই লজ্জা পেয়েছে—ধ্যাৎ, সস্তা সিনেমার পচা নকল। শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠিক করতে পারেনি। বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্টের দাহ গরুর গাড়ির চাকার মতন গড়িয়ে গেছে কঁকিয়ে কঁকিয়ে।

এলোমেলো ভাবতে ভাবতেই মনে পড়েছিল মিনুর কথা। সেই জন্ম-দিনের উৎসবেই বাবার কথার সূত্র ধরে মিনু বলেছিল—বাবার ওপর রাগ

করিস না বিলু। রাগ করে লাভ নেই। আমরা এখন এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থায় বাস করছি যেখানে নারীকে যৌনযন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবা হয় না। যন্ত্রের ওপর কি মানবিক সম্পর্ক চাপানো চলে? আসলে আমরা এক গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। অন্ধকারে মা-বোনের মুখ আলাদা করে চেনা যায় না!

শালা জ্ঞানদা! অমন মেঠো বক্তৃতা শালা সবাই দিতে পারে। অস্তিত্ব চুরমার হয়ে গেলে কী বলবি রে, জ্ঞানদা? বিলুর মাথা ঝিমঝিম করে।

আর রীলটা ঘুরে যায়। চোখের সামনে ছবিটা স্থির হয়ে থাকে—সুপার-ইম্পোজ্‌ড দৃশ্য।

ঢকঢক করে অনেকখানি হুইস্কি গেলে বিলু।

বাঘার চোখ

ঘুরেঘুরেঘুরেঘুরে নাচছে মেয়েটি। ঘরের হাই-ফাই সেটে উদ্দাম বাজছে ক্যালিপ্‌সো সঙ্গীতের রক্তে জোয়ার আনা সুর। মেয়েটির পরনে গোলাপী স্ল্যাকস। গায়ে পাতলা—অতি মিহি নাইলনের আঁটো জামা। ক্ষীণ আবরণ ঠেলে সার্চলাইটের মতন জোরালো বুকের দ্যুতি ক্রমাগত বিদ্ধ করে বাঘার চোখ। ওর দুচোখ বিদ্ধ করেই যেন ঘুরেঘুরেঘুরেঘুরে নেচে যাচ্ছে এক জোড়া সরব স্তন।

বাঘার বড়ো বড়ো চোখ আরো বড়ো হয়। গলার মধ্যে পিপাসা উগ্র হয়ে জমে। ইচ্ছে করে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে যায় আড়ালে। তারপর… তারপর নিঃশেষে দেখে নেবে যৌবনের কতখানি উদ্ধত সঞ্চয় আছে ঐ অগ্নিবলয়ে।

বাঘার এক বন্ধুই নিয়ে এসেছে মেয়েটিকে। ও ছাড়া আরো তিনটি মেয়ে আছে! বাঘারাও চারজন। (বাঘা ছাড়া কেউই তাদের আড্ডার নয়।) অন্য মেয়ে তিনটে বাঘার পূর্বচেনা (ঘাঁটা হয়ে গেছে) সেজন্য ওদের প্রতি তার মনোযোগ নেই। এই মেয়েটিকে এনে বন্ধুটি গোপনে বলেছিল, একেবারে নতুন। কীরকম নাচে দেখিস। ফিগার দেখেছিস? রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবে।

তা দিয়েছে। সে-আগুনে জ্বলছে বাঘার প্রতিটি রোমকূপ। দুচোখ যেন

কোটর থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে মেয়েটির বুকে। ও আর স্থির থাকতে পারে না। বিশাল শরীর নাচিয়ে সকলকে উদ্দেশ করে বললো, কাম অন! লেটস ডান্স টুগেদার। বলেই বড়ো বড়ো দাঁত বের করে হেসে উঠল। ওর ঐ হাসি দেখে বাঘের হাঁ মনে পড়ে যাবেই।

বাঘা আর দেরি করে না। ধাক্কা খাওয়া মাতালের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটির গায়ে। দুহাতে জাপটে নাচতে থাকে। মেয়েটি ওর রসার্দ্র লোলুপ চোখের দিকে তাকিয়ে ভুরু টেনে মৃদু হাসে। কৌশলে নিজেকে সামান্য আলগা করে নেয়, সরে যায় না। বাঘার পিঠে হাত রেখে নাচে।

একজন মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজালো—শাব্বাস গুরু!

মাথা ঝাঁকিয়ে বাঘা গর্বের হাসি হাসল। নাচ ক্রমশ উদ্দাম হয়। আটজনই দৃকপাতহীন নাচে। হাইফাই সেটে ক্যালিপসো অন্তহীন ঝড়ের ঝঞ্ঝনায় বাজে।

বাঘার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসে। ও মেয়েটার কোমর-ধরা হাতটা তার বৃত্তচাপের মতন বুকের খাঁজে ঠেলে দেয়। সেভাবেই ঘুরে ঘুরে নাচে। হাতটা আরেকটু ঠেলে—তারপর আরও একটু। সার্চলাইটের জোরালো বিলাপে বাঘার হাত মুচড়ে ওঠে। মেয়েটি এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে হিসহিস করে বলে—ডোন্ট বি নটি!

নাচ চলে। ক্যালিপসো উদ্দামতর।

বাঘার আরক্ত চোখে ঘূর্ণি। ও ভরা গলায় বলে—চুপ করে নেচে যাও, খুকি! আমাকে থামাবার চেষ্টা করো না।

পাশ থেকে চকাশ শব্দ ওঠে। তৎসহ গলগল উল্লাস—লাভলি—আবার হোক—

ঠিক হচ্ছে। সবই নিয়মমাফিক চলছে। কুছপরোয়া নেই! বাঘার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। আর একটু হলেই মুডটার বারোটা বেজে যেত!

বাঘার হাত আবার আগ্রাসী হয়।

মেয়েটি বাধা দিয়ে বলে—এসব কথা ছিল না আমার সঙ্গে।

কৌতুক ঝিলিক দেয় বাঘার চোখে।—ও, এই ব্যাপার!···হেসে বলে, কী কথা ছিল?

—শুধু নাচতে হবে।

—ও! ঠিকই কথা হয়েছে। এখন সকলে মিলে নাচ। পরে শুধু দুজনের

নাচ। ওটাও নাচই। দ্য মোস্ট হেভেনলি ডান্স অব টু নেকেড বডিজ।

বাঘার চোখে মেয়েটির নগ্ন শরীর। লাগামছাড়া কল্পনায় ও উত্তেজনা বোধ করে।

মেয়েটি বললো—না। শুধু এই নাচের কথাই হয়েছে।

বাঘার মাথায় ঝনাৎ করে রক্ত ওঠে। দৃঢ়ভাবে ফোঁস ফোঁস করে বলে—এখন তো কথা হল। কত টাকা চাই বলো, পাবে।—দখলের দাবিতে মেয়েটির স্তনে শক্ত হাত রাখে বাঘা।

বাঘার মুঠোর মধ্যে সাপিনীর মতন ফোলে মেয়েটি। কঠিনস্বরে বলল—টাকা দিলেই হয় বুঝি? য়ু শুড হ্যাভ নোন আয়্যাম নো হোর।

ছিটকে সরে গিয়ে সোফায় বসে হাঁপায় মেয়েটি।

বাঘার শিরায় শিরায় ভূস্বামীর অহঙ্কার গর্জন করে। হাতের মুঠো থেকে সরে যাবে শিকার? দেখা যাবে কত ধানে কত চাল!

দেখাতে পারেনি বাঘা। একটু পরেই মেয়েটি চলে যায়। কোনো কিছুর বিনিময়েই শয্যাসঙ্গিনী হতে রাজি হয়নি। ব্যর্থতার দুঃসহ আক্রোশে ফুঁসতে থাকে বাঘা।

দিনকাল আগের মতন নেই। নইলে ওকে তুলে নিয়ে আটকে রাখত মহফিলখানায়। যেমন তার ঠাকুর্দা, বাবার ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা করেছে। শালার স্বাধীনতা—গণতন্ত্র। নিকুচি করেছে গণতন্ত্রের। ইচ্ছেমতন ফুর্তি করা যাবে না? ফুর্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া অগণতান্ত্রিক নয় বুঝি!

বাঘার চিন্তা ক্ষিপ্ত—যেন পাগলা ঘোড়া। সম্ভব-অসম্ভব নানা কৌশল ভাবে মেয়েটিকে দখল করার। সন্তোষজনক কোনো সমাধান পায় না। না পেয়ে আরো ক্ষেপে যায়।

সারাক্ষণ চোখের মণি ফুঁড়ে ঘুরেঘুরেঘুরেঘুরে নাচতে থাকে সার্চলাইটের মতন দুটি উদ্ধত স্তন।

ক্রুদ্ধ হাতে বোর্ডে টাকা ছুঁড়লো বাঘা। যত হারছে তত বেশি টাকা ছুঁড়ছে। হুইস্কি ঢালছে গলায়। মুখে দামী সিগারেট ঝুলিয়ে হুঙ্কার দেয়—আগুন—

টিপুর বিষাদ

ক্লোজ-আপে ইজেলের মতন ঋজু স্থির একটি মেয়ে। ঠোঁটের রেখায় বিদ্রূপের চাবুক নড়ে। চোখে কাঁপে তাচ্ছিল্যের ঠাট্টা। তন্বী শরীর সুষম ছন্দে একটা ভঙ্গি তোলে—উদাসীন আলস্যে শাড়ির আঁচল থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘাসফড়িংয়ের মৃদু উপদ্রব।

এবার ক্যামেরা সরে যায়। মেয়েটির অবয়ব ছোট হয়—আরো ছোটো—আরো ছোটো—একটা পিনের মতন। শেষ মুহূর্তে এক পলক ইস্টম্যান-কালারের সস্নেহ আঁচড় আর তুলকালাম বিসমিল্লা খাঁর সানাই।

তারপরেই পর্দা শাদা—শুকনো নদীর চর। আবহ সঙ্গীতে ঝরাপাতার মর্মর। বা মরুভূমির ঝড়।

ধীরে ধীরে পর্দায় ফুটে ওঠে একটি ঘরোয়া দৃশ্য। ড্রইং রুমে সোফায় বসে আছেন মধ্যবয়েসী ব্যবসা-সফল পুরুষ। টিপু পাশে দাঁড়িয়ে। মুখে বিরক্তি আঁটা।

—বসো, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

অনিচ্ছার সঙ্গে বসে টিপু বললো, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। আমাকে বেরুতে হবে। কাজ আছে।

—তোমার কাজ তো জানি! হয় আড্ডা দেবে, নাহয় কোনো মে—' থেমে আবার বলেন বাবা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তির মেলায় যাবে।

ছ বছরেও চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সি শেষ করেনি টিপু। পরীক্ষা দেয় না। বাবার ক্ষোভ টিপু জানে।

—এসব বলার জন্য ডেকেছেন নাকি ?

টিপুর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বাবা বললেন—না। শিরিনের সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যাপারটা পাকা করতে চাই।

—শিরিনের সঙ্গে বিয়ে! আমার ?—অকৃত্রিম বিস্ময়ে টিপু বলে। হাহা শব্দে হাসে।

—কথাটা হাসির নয়। তুমি অবাক হবার ভান করছ কেন তাও বুঝছি না। অনেকদিন তো ঘুরলে ওর সঙ্গে—তোমার কি ওকে পছন্দ নয় ?

এই প্রথম টিপুর মনে হয়, বাবা খুব সিরিয়াস। নিজের মুখটাও ভারি করে টিপু উত্তর দেয়—আমি কার সঙ্গে কতদিন ঘুরি এসব খবরও যে আপনি

রাখেন জানতাম না। যাকগে, শিরিনকে আমি বিয়ে করছি না, বিয়ের কথা ভাবছিও না।

বলেই উঠে দাঁড়ায় টিপু।

—বসো।—বাবা ধমকে ওঠেন—কথা এখনো শেষ হয়নি।

টিপু অবাক চোখে বাবাকে দেখে। হল কী আজকে? বাবার সঙ্গে ওর দেখাসাক্ষাতই হয় না। তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করার পর পাঁচ বছরে বাবার সঙ্গে পাঁচটা কথাও বলেছে কিনা সন্দেহ। বিশাল বাড়িতে ইচ্ছামতন আসে যায়। নিজের ঘরে নিজের মনে যা-খুশি করে। চাকরবাকর হুকুম তামিল করার জন্য, খাবার-দাবার দেবার জন্য সারাক্ষণ হাতের কাছে মজুত! টাকার দরকার হলে স্লিপ পাঠিয়ে দেয় ম্যানেজারবাবুর কাছে। পাঁচ বছর ধরেই এমন চলছে। নিজের মা অভিমান নিয়ে কোথায় আত্মগোপন করে থাকেন, টিপু খবরই পায় না। বাবার আর দুজন স্ত্রী, বিশেষত তৃতীয়া, ভয়েই টিপুর ধার মাড়ায় না। আজ হঠাৎ পিতৃদেবের হল কী?

—বিয়ে যদি করবে না তো ওর সঙ্গে এত ঘোরাফেরা করলে কেন! ওর বাড়ির সকলে জানে তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে, অ্যাণ্ড…অ্যাণ্ড—আয়্যাম টোল্ড য়ু হ্যাভ—অলরেডি—, শব্দ খুঁজে খুঁজে শেষ করেন—গন ট্যু ফার! এখন না বললে চলবে কেন!

টিপু বোঝে বাবা আসলে বলতে চেয়েছিলেন, অলরেডি স্লেপ্ট উইথ হার। ইচ্ছে হল বলে, যত মেয়ের সঙ্গে শোবো সবাইকেই বিয়ে করতে হবে? তবে তো হারেম খুলতে হয়! এসব মূর্খতার কোনো মানে আছে? মেয়েরা তো সঙ্গে নিয়ে শোবার জন্যই। একবার ভুল করেছিলাম বলে বারবার করবো?

এসব কথা বাবাকে বলা যায় না। কী ক্ষতি বললে? বড়ো হলেও বাবা-ছেলে, দুজন পুরুষ বন্ধুর মতন—যাকে বলে ম্যান টু ম্যান—কথা বলতে পারে না কেন? এ দেশে—এ সমাজে চলে না এসব। স্বীকৃত মূল্যবোধের প্রাচীর ভাঙা যাবে না। ভাঙলেই বলবে, বখাটে।

টিপুকে নিরুত্তর দেখে বাবা আবার বললেন—আমি তো জানতাম—সকলেই বলত—য়ু লাভ হার।

লাভ? ভালোবাসা? টিপুর ইচ্ছে হলো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। এর চেয়ে কৌতুকজনক কথা ও শোনেনি। ভালোবাসা কাকে বলে? অভিধানে আর সিনেমা-নাটকে ছাড়া আর কোথাও ভালোবাসা আছে নাকি? রাবিশ!

মিথ্যা আবিষ্কারে মানুষের সৃজনী শক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ভালোবাসা শব্দের উদ্ভাবন। দ্য গ্রেটেস্ট ব্লাফ দ্যাট ম্যান কুড ইনভেন্ট। আমি মূর্খ, আকাট মূর্খ—তাই না-বুঝেই একবার ভেবেছিলাম ঐ চূড়ান্ত মিথ্যাটাই বুঝি পরম সত্য। যার কোনো অস্তিত্ব নেই, সেই পবিত্র পর্বতের চূড়া খুঁজতে বেরিয়েছিলাম জীবনের সর্বস্ব পণ করে! এক অন্ধকার খাদের মধ্যে পড়েই পর্বতচূড়া সন্ধানের সরণি শেষ। টিপুর ইচ্ছে হল বলে, বাবা, আমি মেয়েদের অনেক—অনেক ভাবে খুঁজে পেতে দেখেছি, কোথাও ভালোবাসার নিবাস নেই। যা আছে, সেই অন্ধ-উত্তেজনার স্বেদময় রসায়নকেই কি মানুষ ভালোবাসা বলে?

এসবও বাবাকে বলা যাবে না। সংস্কার। মূল্যবোধ। শ্রদ্ধা সমীহা ইত্যাদির তাক-করা সঙিন-প্রহরা। ছোঃ!

নির্লিপ্তস্বরে টিপু বললো, আপনি ভুল শুনেছেন। আমাদের মধ্যে লাভ-ফাবের কোনো ব্যাপার নেই।

—তার মানে? তবে যে ঘোরাঘুরি—

—ঘোরাঘুরি করলেই ভালোবাসতে হবে? যত মেয়ের সঙ্গে ঘুরি সকলকে বিয়ে করতে হলে তো কয়েক ডজন বিয়ে করতে হবে।

টানতে গিয়ে চুরুটটা চিবিয়ে ফেলেন বাবা। একদলা ধোঁয়া একসঙ্গে গলায় আটকে কষ্টকর কাশি উঠে আসে। চোখমুখ লাল। কী বললো টিপু? কী করে বলতে পারলো তাঁকে? কয়েক ডজন বিয়ে! ছেলে হয়ে বাপকে বলতে একটুও বাধল না! কী যে দিনকাল পড়েছে!

বাবা ক্রুদ্ধস্বরে বলেন—তোমার লজ্জা করে না এসব বলতে?

—লজ্জা করবে কেন।—নিরীহ জবাব টিপুর।

—তুমি কথা দিয়েছ শিরিনকে বিয়ে করবে। বলেছ, ওকে ভালোবাসো। আর এখন—তা চলবে না। ওকে তোমার বিয়ে করতেই হবে।

—ও, এই কথা!—শেয়ালের মতন খ্যাক খ্যাক হাসে টিপু—ঠিক এই কথাগুলো আমি কখনোই বলিনি। আর বললেও লজ্জা পাওয়ার কারণ দেখি না। আপনার কি লজ্জা করে দশ লাখ টাকার লাইসেন্স পঞ্চাশ লাখে বেচে দিতে? কুড়ি লাখ টাকার মাল ইনডেন্ট করে সত্তর লাখ টাকা বিল করতে? আপনার কি লজ্জা করেছিল স্ত্রী থাকতেও দ্বিতীয়বার, দুটো স্ত্রী থাকতেও তৃতীয়বার বিয়ে করতে?

হতভম্বের চোখে ছেলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা বলেন, ব্যবসার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক? আর—আমি বিয়ে করেছি—হ্যাঁ ধর্মসম্মতভাবে বিয়ে করেছি—তোমার মত—

ডান হাতটা ঢালের মতন বাড়িয়ে বাধা দেয় টিপু—থাক। আমার খুব জানা আছে সব। ব্যবসা, ধর্ম সবই আপনার এক-একটা বর্ম বা আরো ঠিক করে বলতে গেলে বোরখা, যখন যেটা সুবিধে গায়ে চাপিয়ে কাজ হাসিল করেন। ভাবেন বোরখার আড়ালে কী করছেন কেউ টের পায় না!

—থামো!—গর্জন করেন বাবা। অনেকক্ষণ ধরে ঔদ্ধত্য সহ্য করেছেন। আর না। তাঁর ধৈর্যের সীমা আছে।

—আমাকে ধমকে কী করবেন! যা করছেন করুন, কেবল আমাকে টানবেন না! বোরখা পরার মধ্যে আমি নেই। শিরিনকে বিয়ে করলে আপনার যে কয়েক লাখ টাকার শেয়ার লাইসেন্স পেতে সুবিধে হবে, সে আমি খুব জানি। সেটা হবে না। ওসব আপনি ভুলে যান।

—কেন ভুলে যাবো? আমি—আমি—কী বললে যেন হ্যাঁ—বোরখা পরে ব্যবসা করি, আর তুমি—তুমি ভালোবাসা—বিয়ের নাম করে মেয়েদের নিয়ে কী করছ—বেসামাল চিৎকার করেন বাবা।

টিপুর মুখটা কঠিন হয়ে আসে। সরাসরি বাবার মুখের ওপর চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে বলে—আমি যাই করি না কেন ভালোবাসা বেচে পেনিসিলিন কিনি না, পেনিসিলিনের সংখ্যায় টাকার হিসেব মেলাই না।

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না টিপু। জেট গতিতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাথার মধ্যে সেই ফিল্ম রোলটা ঘোরে।

খুব উঁচু পাহাড়ের ওপরে ফুলের বাগান, নীল হ্রদ, প্রজাপতির মতন একটা মেয়ের ঋজু আদল। টিপু ছোটে ছোটে ছোটে—দিগ্‌বিদিকজ্ঞানহীন উদ্‌ভ্রান্তি নিয়ে। ঐ চূড়ায় ওকে পৌঁছতেই হবে। ও ছোটে—ছোটে। হঠাৎ হোঁচট লাগে, পায়ে কঠিন শিলার আঘাত কিংবা পায়ের তলা থেকে সরে যায় শিলাখণ্ড। অন্ধকারে খাদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ওর চোখের পর্দা থেকে ক্লোজ আপের তন্বী শরীর দূরে সরে যায়—আরো দূরে আরো আরো দূরে—পর্দাটা শাদা ধুধু করে। বিশাল প্রান্তর জুড়ে শুকনো পাতার মর্মর বাজে আবহে। বা মরুভূমির ঝড়।

টিপুর গলা শুকিয়ে জ্বালা করে। হাজার বছরের তৃষ্ণা ওর বুকে। এক ঢোকে পুরো গ্লাস শেষ করে। তাস তোলে হাতে।

মণির ঘূর্ণি

ক্যামেরার ফ্রেমে কাদা—কঠিন আঠালো কাদা ভরা একটা পুকুর! পুকুরের মধ্যে, কাদার ভেতর অনেকগুলো পাইপ। বাঁশের। মাঝে মাঝে একটা দুটো লোহার পাইপ। পাইপগুলো পারে উঠে হারিয়ে গেছে সাজানো উদ্যানে। সেখানে ছবির মতন ঝকঝকে বাড়ি, চকচকে গাড়ি, সুরম্য রাস্তা। রাস্তা ঘিরে খাদ্যবস্ত্রবিলাসের বিপণিবিতান। বাতাসে জলতরঙ্গের স্নিগ্ধ শিঞ্জন। ফাঁকে ফাঁকে ফরাসি পুতুলের মতন সুন্দরীদের আঁচল পতাকা হয়ে ওড়ে।

কাদার মধ্যে ডুবে থাকা একটা মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে উঠে আসতে। যত চেষ্টা করে তত ডুবে যায়। আরো পাঁক আষ্টেপৃষ্টে ঘিরে ধরে তাকে। বাঁশের পাইপ ধরে ওঠার চেষ্টা করে। চাপ লাগতেই পুরনো বাঁশ ঝুরঝুর করে ভেঙে যায়। ও লোহার পাইপ ধরতে চায়, কিছুতেই নাগাল পায় না। কাছেও পেঁছিতে পারে না। লোকটা জানে না অবশ্য যে ঐ লোহার পাইপ উদ্যানের আলোকসজ্জার গ্যাস সরবরাহ করে।

ক্যামেরা এবার লোকটার দিকে এগিয়ে যায়। মুখটা অস্পষ্ট। অসহায় আর্তিতে বিক্ষত। কিছুতেই বোঝে না যে ঐ লোহার পাইপগুলো তুলে ফেলতে না-পারলে কোনোদিন উঠতে পারবে না। ভেতরের গ্যাস যদি উদ্যানের ঔজ্জ্বল্য রাখতেই খরচ হয়ে যায়, ওকে ঠেলে তোলার শক্তি কখনোই জমবে না। তা না জমলে উঠে আসা অসম্ভব। লোকটা ক্লান্ত হাতে আবার একটা বাঁশের পাইপ ধরে। বাঁশটা ভেঙে যায়। আকণ্ঠ কাদার মধ্যে ডোবা লোকটার মুখ কেবল আকাশের ঝুলে থাকা বুক থেকে বাতাস চাটে। চাটতে চাটতে মাথাটা ঘোরে। চারদিকে, প্রথমে আস্তে, তারপর একটু জোরে, শেষে লাট্টুর মতন বনবন ঘোরে। হঠাৎই ফুস করে ঘূর্ণি থেমে যায়। লোকটা আবার একটা বাঁশের পাইপে হাত দেয়। মুখটা ক্লোজ আপে স্বচ্ছ হয়। মণি নিজেকে দেখে। মাথাটা আবার ঘোরে। উত্তরে—মা। দক্ষিণে—বোন। পূর্বে—ভাই। পশ্চিমে—একটা বিরাট ইস্তাহার। লেখাগুলো ও পড়ার চেষ্টা করে না। জানাই আছে, ওতে নৈতিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় নানা দায়িত্ব

ও কর্তব্যের ফিরিস্তি দেওয়া আছে—মূল্যহীন অথচ ওজনে ভারি শব্দসমষ্টি। ঘূর্ণি থামে। ফ্ল্যাশ ব্যাক। চায়ের কাপ হাতে মামার মুখোমুখি মণি।

মামা মণির তুলনায় বয়েসে অল্পই বড়ো। মণির মায়েরা পাঁচ বোন। তারপর এই এক মামা। মণির মা তালিকায় প্রথম। জীবনে আর কোথাও ফার্স্ট হতে না পারলেও জন্মসূত্রে ভাই-বোনদের সকলের আগে। আরো একটা ব্যাপারে মাকে ফার্স্ট বলা যায়। সব বোনেদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক-সন্তান প্রসব করার গৌরব লাভ করেছেন। সর্বমোট নটি। প্রথম দুটি কন্যার পর মণি—জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাবা মৃত্যুর আগে প্রথম দু বোনের বিয়ে দিয়ে গেছেন। মণি *এজন্য ভদ্রলোকের* প্রতি রীতিমতো কৃতজ্ঞ বোধ করে। নইলে মাকে নিয়ে আট + আরো দুই, মোট দশজনের ভাত-কাপড় জোটাতে হত। আটজনের ব্যবস্থা করতেই ঘূর্ণি উঠছে। সাত ভাইবোন চম্পা পারুল আর মা শিউলি।

মামা অল্পই বড়ো বলে মণির সঙ্গে হাসি মশকরা চলে। একসঙ্গে সিগারেটও টানে। আজ মামা একটু মামার মতন কথা বলছিলেন।

—তুই ফ্যাকট্রির কাজটা নিলি না। অথচ তোরই বন্ধু মিনু দিব্যি করছে। তার সংসারটাও কিছু ছোটো না। বাপমাসহ তিনটে ভাইবোন। তোকে অত করে বললাম, রাজি হলি না। কোয়ালিফিকেশন আছে তোর। তাড়াতাড়ি প্রমোশন পেতিস। অ্যাদ্দিনে হয়তো ঐ মিনুরই ইনচার্জ হয়ে যেতিস।

—থামো তো মামু। যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হতাম তাকে তুমি একটা অর্ডিনারি মেকানিকের কাজ করতে বলো? ঐ কটা টাকায় সংসার চলবে?

—একটা বাঁধা মাইনে তো পেতিস। কিছুটা সুরাহা হত। কপাল খারাপ, নইলে এমন হঠাৎ জামাইবাবু মারা যাবেন কে ভেবেছিল। দুটো বছর আর চালাতে পারলেই—কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হতে যখন পারলি না, অন্য একটা কিছু তো করতে হবে। বিরিয়ানি জুটল না বলে কি ভাত রুটিও খাবি না।

—ঐ চাকরি নিলে ভাত রুটি খাওয়া হত না মামু। কেবল খাবি খেতে হত।

মামা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—কাজটা এখনো হতে পারে। তুই ভেবে দ্যাখ মণি। ভাইবোনগুলোকে মানুষ করতে হবে। বোনেদের বিয়ে দিতে হবে। তুই সবার বড়ো, তোকেই দেখতে হবে।

মণির হাসি পায়। মামাও উপদেশ দিচ্ছে। খরচা লাগে না তো।

আসলে ভয়। যদি ও ভাইবোনদের দায়িত্ব না নেয়। ধুৎ, তা কখনো হয় নাকি। মণি যে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য নিজের কাছেই দায়বদ্ধ এই বিশ্বাসটাই মামাদের নেই। মাও হয়তো মাঝেমাঝে দ্বিধায় শঙ্কায় বিচলিত বোধ করেন। মণি কী করে বোঝাবে, ভাইবোনেরা সকলে তার আপন অস্তিত্বের অংশ, হাত পা নাক চোখের মতন। ওদের অবহেলা অগ্রাহ্য করার কথা মণি কোনো দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে না।

হঠাৎ একটা পুরানো কথা মনে পড়ে।

মামা চাকরির সঙ্গে বাড়তি রোজগারের জন্য ইনসিওরেন্সের এজেন্সি চালান। একবার বাবাকে ধরেছিলেন একটা পলিসি গছাবার ধান্ধায়। পলিসি করলে কী কী সুবিধে—লাভ—সে সম্পর্কে একটা লম্বা লেকচার দিয়ে মামা চুপ করলে বাবা বলেছিলেন—আমি আর নতুন কী পলিসি করব বলো। আমার নটা পলিসি তো আছেই। বলে বাবা ওদের ভাইবোনদের দেখিয়েছিলেন।

কথাটা মনে পড়তে মণি বললো মামু, মনে আছে লাইফ ইনসিওরেন্স করার কথা নিয়ে বাবা কী বলেছিলেন ?

মামা হাসেন—খুব মনে আছে। তোরাই তাঁর ন'টা পলিসি।

—হুঁ। পলিসিই করেছেন, প্রিমিয়াম দেবার ব্যবস্থা করে যাননি। দুটো পলিসি অবশ্য তিনি বেঁচে থাকতেই পেড-আপ করে গেছেন। বাকিগুলোর প্রিমিয়াম আমাকে দিতে হবে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, মামু। যদি নিজেরটা বাঁচাতে পারি তবে অন্য পলিসিগুলোর প্রিমিয়ামও ঠিক দিয়ে যাব।

মামা ভাবলেন মণি বুঝি চটে গেছে। তাড়াতাড়ি করে বললেন, আমি সেসব ভেবে কিছু বলিনি। তোকে কি আমি জানি না! বলছিলাম চাকরিটা নিলে তোর ঐ প্রিমিয়াম দেবারই সুবিধে হত।

একটি অতি লম্বা শ্বাস ফেলে মণি বলে—মামু, ও কটা টাকায় কী হবে! আমি সেই নুন আনতে পান্তা ফুরানো জীবন চাই না। আমার অনেক টাকা চাই। অনেক অনেক টাকা। চাকরি করেই হোক বা আর যে ভাবেই হোক টাকা আমার চাই। শুধু দুটি অন্ন খুঁটি করে বাঁচতে রাজি নই আমি। ওভাবে বাঁচাকে বাঁচা বলে না।

—কী করবি তুই ?

—জানিনা কী করব। উপযুক্ত চাকরির চেষ্টা করছি। পেলে ভালো।

না পেলে অন্য রাস্তা দেখব। সেটা কী রাস্তা, আমি তোমাকে এক্ষুনি বলতে পারব না।

মামা চলে যাবার পরও চিন্তাগুলো সন্ন্যাসীর জটার মতন ওর মাথায় ঝোলে। সারাক্ষণই ঝোলে। মাঝেমাঝে জটার ভারে মাথা টনটন করে। সেই টনটন করা ব্যথাটাই ক্রমশ গ্রাস করছিল ওকে।

মা এলেন দীর্ঘ তালিকা নিয়ে। চাল ডাল চাই। বোনেদের শাড়ি জামা নাহলেই নয়, ভাইদের স্কুলের মাইনে বাকি পড়ে গেছে। তাঁর বাতের ওষুধ ফুরিয়েছে অনেকদিন। মণির পরের বোনটার বিয়ে দেওয়া দরকার, যথেষ্ট বড়ো হয়েছে। কলেজে পড়া ভাইটার বইপত্র কেনা হয়নি—ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনতে শুনতে মণির মাথার মধ্যে অস্থির অসহায়তা টলমল করে। এত সব কী করে করব আমি—কেমন করে পারব? সব কিছু আমাকেই করতে হবে? আমি করতে বাধ্য! কেন—কেন? নতুন নতুন পলিসি করার সময় বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি কেবল যার প্রিমিয়াম গুণে যাবো সারা-জীবন? বড়ো হয়েছি বলে! বড়ো হওয়া অপরাধ? আমি ইচ্ছে করে—যেচে—বড়ো হতে চেয়েছিলাম?

এমন অসংখ্য প্রশ্ন মণির মাথায় ফোটে—যেন পিনকুশনের মধ্যে একটার পর একটা পিন গাঁথে কেউ। মণির ইচ্ছা হয় চিৎকার করে। সবকিছু ভেঙে চুরমার—তছনছ করে দেয়।

কিছুই করে না; মাকে আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ে কৃষ্ণচূড়া লালে লাল। মণির খুব ভালো লাগে। আশা করতে ইচ্ছে করে, একদিন বড়ো চাকরি করবে—নিজস্ব চেম্বার, সুশ্রী সেক্রেটারি, গাড়ি, মাসান্তে চার অঙ্কের শ্রদ্ধেয় নিশ্চিতি। ভাইয়েরা সব ভালো ভালো স্কুল কলেজে পড়বে—যে যা পড়তে চায় পড়তে পারবে। বোনেদের বিয়ে দেবে তারই মতন কৃতী পুরুষের সঙ্গে। নিজেও একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করবে, যে হবে একাধারে নর্ম ও কর্মসহচরী। একটি—বড়ো জোর দুটি ছেলেমেয়ে। একেবারে বিজ্ঞাপনের সুখী পরিবার। গৃহকোণে গ্রামোফোন —না, স্টিরিও থাকবে।

আচমকা মড়মড় শব্দে বাঁশ ভাঙে। আবার কাদার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আকাশের দিকে মুখ তোলে ভাসমান মাথা। বাতাস চাটার চেষ্টায় বনবন বনবন ঘুরতে থাকে। চোখের সামনে এলোমেলো দৃশ্য-দৃশ্যান্তর ছোটাছুটি

করে—উদ্যান—কৃষ্ণচূড়া—পাঁক—ইস্তাহার—আইভরি কার্ডে ছাপানো নাম-রঙিন আঁচল—অজস্র টাকার সমারোহ—

ঘূর্ণিটা চলতে থাকে।

খেলার আসরে

এখন রাত সাড়ে এগারোটা। খেলার শেষ বাজি চলছে। হলুদ দাগ বুকে এঁকে সব গ্লাস খালি। কেবল বাঘার গ্লাসে কিছু অবশেষ শেষ চুম্বনের অপেক্ষায়। সকলের মাথার মধ্যে ঘনঘন গোল গোল বৃত্ত আঁকা হচ্ছে নানা রঙের। জিভ সব হাফসোল লাগানো জুতোর মতন। নিচের ঠোঁট জবাই-করা মুরগির মাথার নকলে ঝুলে গেছে। বাঘার বড়ো বড়ো চোখ মোটরের পিছনের লাল আলো।

শেষ দান। মন্টু বেশিক্ষণ 'ব্লাইণ্ড' না-খেলে তাস তুলে নিল। কিছু নেই। প্যাক।

ওর দেখাদেখি টিপুও তাস তুলেই ফেলে দিল। বাঘা ব্লাইণ্ড খেলে। মণিও। হাত ঘুরে আসতে বিলু তাস তোলে। দুটো টেক্কা। খুশি মনে দ্বিগুণ টাকা ছোঁড়ে। হাত ঘুরে যায় কয়েকবার। বাঘা তাস তোলে। সাহেব-বিবি-গোলাম।

ভারি হয়ে আসা চোখের পাতা টানটান করে টাকা ফেলে বাঘা। মনের মধ্যে উল্লাস থৈথৈ। অনেক হেরেছে আজ—চার-পাঁচশ হবে। এবার দেখা যাবে। খেলার জন্ম বিলেতে—তাস আসবে না মানে! চকচকে ছবি আঁকা তাস ফুঁড়ে ওর চোখে ভেসে ওঠে দুটো উদ্ধত সার্চলাইট। দ্বিগুণ বাজিতে টাকা ছোঁড়ে বাঘা।

হাত ঘুরে যায় কয়েকবার। বিলু অস্বস্তি বোধ করে। বাঘার হাত আন্দাজ করতে পারে না। অপেক্ষা করে কখন মণি তাস তোলে।

পকেট হাতড়ে বাঘা টের পায় সঙ্গে টাকা আর বেশি নেই। অথচ মণি এখনো তাস তোলেনি। আরো কতক্ষণ খেলতে হয় কে জানে! ওর মাথার মধ্যে রক্তস্রোত ঢেউ তোলে।

আবার হাত ঘুরতেই মণি তাস তুলল। এক পলক দেখেই টাকা ছুঁড়ল

বোর্ডে। হাত ঘুরে যায়।

—খেইল জমেছে!—টিপু মন্তব্য করে। মন্টু উৎসুক চোখে সবার মুখের দিকে তাকায়। মিনু পিছনে বসে হাসিহাসি মুখে চুপচাপ খেলা দেখে!

কয়েক হাত ঘুরে যেতেই বিলু প্যাক করে তাস ফেলে দেয়।

আবার টাকা ছুঁড়ে বাঘা হিসহিস করে বললো, কীরে শ্লা, দক মরে গেল!

বিলু নিরুত্তরে হাত নাড়িয়ে হতাশ মুদ্রা ফোটায়। বোর্ডের স্তূপীকৃত টাকা দেখে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একশ'র বেশি হেরেছে ও।

মণি আর বাঘা ক্রমান্বয়ে টাকা ফেলে যায়। দুজনের খেলায় কোনো সীমা নেই। বাঘার চোখ জ্বলে। মণিকে তীক্ষ্ণভাবে দেখে ওর হাত আন্দাজ করার চেষ্টা করে। গ্লাসের তলানিটুকু একটা দলার মতন গলায় ঢালে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখল আর টাকা নেই। ওর রাগ হয়। ঝনঝন শব্দ হয় মাথায়। টাকা ফুরিয়ে যাবে কেন?

মণির মুখের দিকে আরেকবার তাকাল বাঘা। শেষ নোটটা ছুঁড়ে বললো —শো।—বলেই নিজের তাসটা লুব্ধ হাতে তুলে নিল। মণি তাস দেখালেই ওর মুখে ছুঁড়ে মেরে টাকাগুলো তুলে নেবে। শ' খানেক টাকা আছে বোর্ডে। বাঘার সমস্ত শিরা-উপশিরা এক শ' মিটার দৌড় শুরুর পূর্ব-মুহূর্তের প্রতিযোগীর মতন টানটান।

অলস ভঙ্গিতে তাস তুললো মণি। হাতের তালুতে ছড়িয়ে একবার দেখল। একখানা তাস টোকা মেরে ফেলল বোর্ডে—স্পেডের টেক্কা।

মন্টু-বিলু-টিপু উদ্‌গ্রীব, ঘন হয়ে ঝুঁকে পড়ে। মিনুর কোনো ভাবান্তর নেই। বাঘার চোখ জিজ্ঞাসু।

মণি দ্বিতীয় তাস ছোঁড়ে—স্পেডের বিবি।

বাঘার মাথায় বিদ্যুৎ। টেক্কা-বিবি ফ্লাশ? খুশির ঢেউ মুচড়ে উঠতে গিয়েও থেমে যায়। যদি ওটা—

আর ভাবতে পারার আগেই মণি তৃতীয় তাসটা ডান তর্জনীর টোকায় মৃদু শব্দ তুলে ফেলে দেয়—স্পেডের সাহেব।

এক রঙের টেক্কা-সাহেব-বিবি। টপ রানিং ফ্লাশ!

বাঘার দুচোখে হিংস্র বিদ্বেষ। দাঁতের তলায় বিষ-যন্ত্রণা।

মনি বললো—এতে হবে? ট্রায়ো তুলিসনি তো?

অসহায় ক্রোধে নিজের হাত ফেলে দিয়ে মণির মুণ্ডু চিবুতে-চিবুতে বাঘা,

বললো—যা শ্লা নিয়ে যা। আজ শ্লা তোরই লাক।

বাঘার তাস দেখে সবারই একটু খারাপ লাগে। বেচারা ভালো তাস পেয়েও মার খেল।

বিলু মণির পিঠে চাপড় মারে—শাবাস! একেবারে ক্যাক্টার করে দিয়েছিস।

মন্টু বললো—ও শালা নির্ঘাৎ জুয়ালগ্ন দেখে ঘর থেকে বেরিয়েছে।

টিপু বললো—এই মণি, একটু টিপস ছাড় দেখি। এরকম স্টেনলেস স্টিলের মতন লাক বাগালি কী করে?

হো হো হাসির ছররা ওঠে।

মিন্নু নিরীহভাবে প্রশ্ন করে—কত গেল বিলু?

নাক কুঁচকে বিলু বললো—শ' খানেক হবে।...তোর কত গেল বাঘা?

হতাশভাবে বাঘা বলে—একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে গেছি রে! নেট পাঁচশ বেরিয়ে গেল।—ওর মাথার মধ্যে নেশা পাক দেয়।

মণি এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে টাকা গুনে পকেটে রাখছিল। ফুলে ওঠা মানিব্যাগ পকেটে গুঁজে মিন্নুকে বললো—পাঁচ'শ ছত্রিশ। তোর একমাসের মাইনের চেয়েও বেশি।—ওর মুখে থিরথির প্রসন্নতা।

মিন্নু হেসে বললো—অত লাফাসনে। আজ জিতলি। কালই যে তোকে পাঁচশ দিতে হবে না তার গ্যারান্টি আছে?

—কালকের কথা কাল ভাবব। আজ তো নিশ্চিন্দি। এখনকার মতন প্রিমিয়াম দেবার ব্যবস্থা তো হল।

টিপু হঠাৎ দার্শনিক হয়ে যায়—জীবনে কোথাও কোনো গ্যারান্টি আছে নাকি? ওয়ার্ল্ড মে এণ্ড টু নাইট! যতক্ষণ আচো, খাওয়া, লুটে নাও। বুয়েচ?

মিন্নু চুপ করে থাকে। এসব মাতাল জুয়াড়িদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। এরা মনে করে, ঐভাবে দিনাতিপাত মানেই জীবন। কিন্তু এটা যে জীবনের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে অন্ধকার দেওয়ালের আড়ালে মুখ লুকোনো—তা এরা বুঝবে না। মণির জন্য কষ্ট হয় ওর। অনেক বুঝিয়েছে। কিছুতেই শুনবে না।

বাঘা বাথরুমে গিয়েছিল। টিপুর কথার শেষটুকু শুনে বললো—কী বলছিস টিপু? ওর পা উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু ছুঁয়ে ছুঁয়ে পড়ে।

টিপু জবাব দেয়—আমি কিস্যু বলিনি ভাই! জ্ঞানদা বলেছে।

বাঘা বললো—ও শ্লা আবার কী জ্ঞান দিল? কী নতুন মাল ছাড়লে চাঁদ? সরাসরি মিন্টুর ওপর চোখ ফেলে বাঘা।

মিন্টু কিছু বলার আগেই মণি বলল—ওর কথা ছাড়। জানিসই তো ও কী বলে। মদ খাওয়া উচিত না। জুয়া খেলা খারাপ। এসব জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো। এই সব আর কী। ছোড় ইয়ার। চল যাওয়া যাক।

বাঘার মাথার মধ্যে নানা রঙের বৃত্তগুলো দপদপ করে। চোখের মধ্যে সার্চ-লাইটের আলো পড়ে। স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বললো—নামটা মিন্টু বলে জীবনেও মিনমিন করে বাঁচতে হবে? তোমার ঐ জ্ঞানের খ্যাঁতা পুড়ি শ্লা।

তারপর মণিকে টেনে বললো—এই শ্লা চামচিকেকে বলে দিস এখানে এসব বাতেল্লা চলবে না। শ্লা পাইটি ছাড়বে না—ফুর্তি লুটবে পুরো।

মন্টু বলে—এটা বোলো না বাঘা। ও কি ফুর্তি লুটেছে? মিন্টু মালও খায় না, তাসও ছোঁয় না।

—তুই থাম, গাণ্ডু!—বাঘা চেঁচায়—ও শ্লার মুরোদ আছে নাকি? ব্যাটা ইমপোটেন্ট—বাঞ্চোতের দেখেই আনন্দ! ভয়্যারিস্ট।—কুৎসিত ভঙ্গি করে বাঘা। খলখল হাসি হাসে।

মিন্টুর গা ঘিনঘিন করে! ও বেরোবার জন্যে পা বাড়ায়।

হঠাৎ বাঘা ওর হাত টেনে বলে—শোন চাঁদু, আমরা বাঁচতে চাই—আনন্দে—ফুর্তিতে—উইথ আ ব্যাং! তোমার মতন খাকি বিধবা হতে চাই না, বুঝেচ? ভালো না-লাগলে এসো না। কিন্তু এখানে এসে ফুর্তির বেলুনে পিন ফোটাবে, তা চলবে না!

বাঘার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, কথার সঙ্গে মুখ থেকে ছিটকে আসা হুইস্কির দুর্গন্ধভরা থু-থু আর লাল চোখের ক্রূর হুমকি অসহ্য লাগে মিন্টুর। সীমাহীন বিরক্তিতে তেতো—বিস্বাদ ভাব লাগে। চাপা বিদ্রূপে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললো—বুঝেছি। ভাঙা ক্যানেস্তারা পেটালেও শব্দ হবে। পাঁচশ টাকার শোক ভুলতে তাই বাজাও—সশব্দে বাঁচা হবে।

—তোর বাপের টাকায় খেলি বাঞ্চোৎ?

কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই বাঘা তড়িৎগতিতে ঘুসি বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিনুর ওপর।

অক্ শব্দ তুলে মুখ ঢাকল মিনু। অশ্রাব্য খিস্তির অঢেল বর্ষণসহ বাঘার হাত চলে এলোমেলো—শ্লা জ্ঞান দিচ্ছে আমাকে। কুত্তার বাচ্চা লাই পেয়ে মাথায় উঠে গেছে। মণির বন্ধু বলে, নইলে তোর মতন বেজাতকে দিয়ে আমি জুতোও পালিশ করাই না। শুওরের বাচ্চা ক্যানেস্তারা পেটানো শেখাচ্ছ আমাকে। দ্যাখ শ্লা ক্যানেস্তারা কী করে পেটাতে হয়।

বিশাল শরীর নিয়ে টলমল পায়ে এলোপাথাড়ি হাতে বাঘা মিনুর পলকা ছোট শরীরে আঘাতের পর আঘাত করে। মিনুর ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আসে। ওর সাধ্য নেই বাঘাকে পাল্টা আঘাত করার।

মন্টু বিলু টিপু মণি ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে মারপিট হতে পারে এ-ভাবনাই আসেনি কখনো। রক্ত চোখে পড়তে ওদের মাথায় একযোগে সাইরেন বাজে। ওরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের ওপর!

—বাঘা! এই বাঘা—কী করছিস তুই—ছাড়—ছাড় ওকে—

বিলু আর মণি টেনে সরিয়ে আনে বাঘাকে। হাঁফাতে হাঁফাতে বাঘা চিৎকার করে—ছেড়ে দে আমাকে—ঐ কুত্তার বাচ্চাকে আমি জন্মের শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

মন্টু আর টিপু মিনুকে নিয়ে বাইরের দিকে এগোয়। যেতে যেতে বলে—বিলু মণি—আমরা মিনুকে নিয়ে গেলাম!

ওদের যাওয়ার পথের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে বিলু আর মণির জাপটানো হাত থেকে মুক্ত করল বাঘা। ফোঁস ফোঁস শব্দে শ্বাস পড়ে ওর।

—শালা বেজন্মা। করিস তো বাপ্পোৎ কুলিগিরি না মিস্ত্রিগিরি। শ্লার কথার কী আওয়াজ।

বাঘার গর্জন চলে। মণির দিকে ফিরে আবার গর্জায়—স্রেফ শালা তোর জন্তে। নইলে কবে আমি হারামজাদাকে ভাগিয়ে দিতাম। শ্লা সতীন মাগীর মতন কানের কাছে কেবল ঘ্যানরঘ্যানর ঘ্যানরঘ্যানর—

এইসব তর্জন শুনতে মণির ভালো লাগছিল না। মিনুকে মারার ব্যাপারটা সে কিছুতেই মানতে পারে না। মিনুর কোনো অন্যায় ছিল না। এরপর যদি

মিন্টু আর না-আসে খুবই খারাপ লাগবে। কিন্তু বাঘাকে বোঝাবে কে! জমে-ওঠা ক্ষোভ নিজের মধ্যেই জমা রাখে মণি।

আপাতত বাঘাকে শান্ত করা দরকার। মণি বিলুকে বললো—ওকে বসা এখানে। আমি বাথরুম থেকে আসি।

মণি বাথরুমের দিকে পা বাড়াল আর দপ করে আলো নিভে গেল।

—ধুস্ শালা। এই এক খ্যাঁচাকল। রোজ কাজের সময় লোড-শেডিং!—বাথরুমে যাওয়ার তাগিদটা খুবই জরুরি ছিল মণির।

বিরক্ত হয়ে বাঘার কাছে ফিরে এল। বিলু বাঘাকে নিয়ে সোফায় বসেছে। গাঢ় অন্ধকারে ধীরে ধীরে চোখ সয়ে আসে। বাঘার সাদা পাঞ্জাবি অন্ধকারেও ভাসে। বিলু দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শ্রান্ত হাই তোলে। শব্দহীন অন্ধকার নেশার্ত চোখে ভারি হয়ে চাপে।

খসখস শব্দ করে বাঘা পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝোলায়। অন্ধকারে সিগারেট খড়ির রেখার মতন দোলে। প্যাকেটটা পকেটে ঢুকিয়ে বাঘা ভারি গলায় হাঁকে—আগুন—

একটুক্ষণ চুপ থেকে মণি বললো—এই অন্ধকারে আগুন পাবি কোথায়। মিন্টুকে মেরে তাড়ালি। দিয়াশলাই তো ঐ শালার পকেটেই।

বীর্য-শুল্ক

—ডক্টর সেন, আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কতদিন ধরে বলছি, আপনি শুনছেন না। প্লীজ, আই মাস্ট মিট হিম!

—আমি তো বলেছি, মিসেস বোস, তা হয় না। এটা আমাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ, প্রফেশ্যনাল এথিকসের বাইরে। এই অনুরোধ আমাকে করবেন না। আপনি তো জানেন কী বিশ্বস্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে আমাকে এই জটিল কাজ করতে হয়।

—আপনি বিশ্বাস ভাঙছেন না। দু' বছর হয়ে গেল, কেউ জানে না। আমিইতো বলছি আপনাকে, আমি দেখা করতে চাই। আই প্রমিস, কারুকে বলবো না, আপনি আমার সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দিয়েছেন। কিংবা, আপনি আমাকে শুধু তাঁর নাম ঠিকানা দিন, আমি গিয়ে দেখা করবো।

—তা হয় না, মিসেস বোস, তা হয় না। এটা আমি পারি না। ভুলে যাবেন না তারও একটা সামাজিক পরিচয় আছে, নিজস্ব স্ট্যাটাস আছে। জানাজানি হলে ওরও ভীষণ অসুবিধে হতে পারে। আপনি ভাবতে পারেন, ওর স্ত্রী জানতে পারলে কী করবে?

সারিকা নাছোড জেদ করে, কিচ্ছু হবে না। আমি কোনো অসুবিধে ঘটাবো না। কথা দিচ্ছি, ওঁর স্ত্রীও জানতে পারবেন না কিচ্ছু। আমি শুধু একবার দেখা করবো।

রাহুল—ডাঃ রাহুল সেন—অসহায় বোধ করে। কিছুটা বিরক্তও হয়। অর্থবান মানুষের এই রোগ—নিজেদের চাহিদার কাছে অন্য সবকিছুই তুচ্ছ—অর্থহীন। বিশ্বসংসার যেন ওদের দাসভূমি।

নিজের ভেতর ফেনিয়ে-ওঠা উষ্মা গিলে ফেললো রাহুল। সারিকা

বসুর ওপর রাগ করা চলে না। এইজন্য নয় যে, সারিকা অর্থবিত্ত-ক্ষমতাসম্পন্ন মৈনাক বসুর স্ত্রী। একন্যও নয় যে, সারিকা সশস্ত্র সুন্দরী এবং ব্যবহার ভদ্র ও স্মিত। বরং এজন্য যে সারিকা এক অর্থে ওর—রাহুলের —ভাগ্যবিধাত্রী।

ঐই একটি সফল কেসের জন্যই, দু' বছরের মধ্যে, নার্সিংহোম একতলা থেকে তিনতলা হয়েছে। চেম্বারে এয়ারকণ্ডিশনার। ডাঃ রাহুল সেন একটি অতি বিখ্যাত নাম—প্রায়-অদ্বিতীয়ম্। কৃত্রিম প্রজননের বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ। সারিকা বসুর আগে, চার বছরে, ও বহু কেস করেছে। সবগুলো সফল নাহলেও সাফল্যের অনুপাতই শ্লাঘনীয় বেশি। তবু সারিকা-মৈনাকই সেই স্পর্শমণি যা তাকে উপহার দিয়েছে ঈশ্বরের ঈর্ষা ও আয়কর ভবনের অনুসন্ধিৎসা। অতি সরল কারণেই। আর কোনো দম্পতি, ঐ-যাবৎ, কলকাতায় এগারোটি দাম্ভিক ক্লাবের পূজ্য সদস্য ছিল না। সারিকাই তাকে সেই ভাঙন—ব্রেক—দেয়, যাতে তার, কূল না, দু' পকেটে বন্যা আনে। ফল—একতলা থেকে তিনতলা। কিন্তু—

এই কিন্তুটা রাহুলের ধাঁধা। বা জুতোয় আচমকা জেগে-ওঠা পেরেক। মানে প্রশ্ন—ভাগ্য-ভাঙনের জন্য দায়ী কে? সারিকা, না অবিন? সারিকা এসেছিল দু' বছর আগে। অবিন ততদিনে এক বছরের পুরানো। অবশ্য এখনকার, নব-পরিচিত, অবিন। আসল অবিনকে রাহুল জেনেছিল কলেজ-জীবনে ক্রিকেট মাঠে। কিন্তু অবিন না সারিকা? পেরেকটায় সুখরহস্যময় ব্যথা। ব্যথা বা নিরুত্তর ধাঁধা।

রাহুল গভীর স্বরে বললো, আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান কেন?

খুব ধীর, শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সারিকা বলে, আমি জানতে চাই আমার সন্তানের জনক মানুষটা কেমন। এটা জানার অধিকার আছে আমার।

প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে অন্তর্গত বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। সারিকাকে এতখানি আত্মপ্রত্যয়ী এর আগে কখনো মনে হয়নি রাহুলের। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে হয় এই মহিলার যুক্তির দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নাও হতে পারে। প্রতিটি নারীর নিশ্চয় জানার অধিকার আছে ও কোন পুরুষের সন্তান ধারণ করেছে। এই অধিকারকে অস্বীকার করবে কোন বিচারে? বিশেষত এই নারী নিজেই যখন তার দায়-দায়িত্ব, সব কিছু বুঝেও, বহন করতে প্রস্তুত।

রাহুল বললো, ও তো জানে না আপনি ওর সন্তানের জননী।

—আমিই জননী তা না জানতে পারে। কিন্তু এটা তো জানে কেউ না কেউ ওর সন্তানের জননী হয়েছে।

—তা জানে। কিন্তু আমি যদি আপনাকে ভুল—অন্য-কোনো মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই? আপনি তো জানেন না প্রকৃত মানুষটিকে। আমার এখানে একাধিক ডোনার আছে।

ভুরু কুঁচকে এক মিনিট ভাবলো সারিকা। তারপর হাসলো। রক্তিম ঠোঁটের ফাঁকে সারিবদ্ধ ঝকঝকে দাঁতের শ্বেতদীপ্তি নরম আলোর মতন ছড়ায়। বললো, আই হ্যাভ নো চয়েস বাট টু বিলিভ য়ু।

একটু থেমে ঠোঁট টিপে আবার বললো, ফাদার-হুড সব সময়ে বিশ্বাসেরই ব্যাপার। তাই না?

রাহুলও শব্দ করে হেসে উঠলো, হ্যাঁ তা বটে।—কিন্তু ওকে চিনে বা জেনে আপনি কী করবেন? শুধু আমার এখানে দেখেই চলে যাবেন?

সারিকা বললো, না—তা কেন যাবো! মানুষটা সম্পর্কে আমার অনেক কৌতূহল। তিনি কেমন মানুষ, কী করেন, তাঁর জীবনযাপন কী রকম—সব—সবই আমি জানতে চাই। আর—এই যে তিনি পিতা হলেন, অথচ তিনি তাঁর সন্তানকে চেনেন না, কখনো চিনবেন না—এটা নিয়ে ভাবেন কিনা বা তার জন্য কোনো দুঃখ বা অভাববোধ আছে কিনা তাও জানতে ইচ্ছে করে। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমি তাঁর কাছে কী গভীরভাবে কৃতজ্ঞ সেটা আমি নিজে তাঁকে জানাতে চাই। এবং—ইয়ে—মানে—যদি তাঁর জন্য কিছু করতে পারি—

বাধা দিয়ে রাহুল বললো—ফরগেট দ্যাট—ঐ কিছু করার ব্যাপারটা ভুলে যান। একথা একেবারেই মাথায় রাখবেন না। ওকে আগেই বেশি টাকা দেওয়া হয়েছিল। পরে—আপনি বাচ্চা নিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি যাওয়ার পর—মিঃ বোস ওর জন্য আরো দু' হাজার টাকা দিয়েছিলেন আমাকে। ও তো বিশ্বাসই করতে পারেনি। টাকাটা নিতেও চায়নি। আমি অবশ্য বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত দিয়েছি ওকে। আপনি ওর জন্য আর কিছু করতে যাবেন না। কোনো দরকার নেই। প্রাপ্যের চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছে ও।

—আমার হাজব্যাণ্ড কি ওঁকে মিট করেছে?

—না। কক্ষনো না। আমি ছাড়া কেউ জানে না মানুষটি কে। সেজন্য কোনো ভয়-ভাবনা করবেন না মিসেস বোস।

—ভয়-ভাবনা নেই আমার। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু মিট হিম। প্লীজ ডঃ সেন—ডোণ্ট সে, নো। বলুন কবে দেখা করিয়ে দেবেন ?

রাহুল আবার বিপন্ন বোধ করে। এই নাছোড় মেয়েকে নিয়ে কী করা যায় ! এত বলেও বোঝাতে পারছে না যে, কোনো ডোনারকে চেনা বা জানা মাদারের উচিত না।

বললো, আপনি আমার এ-কথাটা রাখুন। ওর সঙ্গে দেখা করবেন না। ওকে দেখে আপনি খুশি হবেন না। ও আপনাদের সমাজের মানুষ না। আপনাদের জীবন-যাপনে ও একেবারে বেমানান।

—তাহলে ওঁকে আরো দেখা দরকার। আপনি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিলেন। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবোই। আই মাস্ট মিট হিম। বলুন, কবে ?

একই কথা রাহুলের বারবার বলতে ভালো লাগছিল না। অনেক বোঝা-বার চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও যখন ছাড়বে না, ওর কোনো দায়িত্ব নেই। নিজের ভালো-মন্দ, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ সারিকা নিজেই বুঝুক।

রাহুল বললো, ও কবে আসবে আমিও জানি না। নিজের ইচ্ছে মতন —যা আসলে প্রয়োজন মতন—ও আসে। ঠিক আছে, ও এলে আপনাকে আমি খবর দেবো। তার আগে আপনি আরেক দিন আসুন। ওর সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি জেনে নিন। তারপরও যদি আপনার ওর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হয় তখন সে ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে।

উঠে দাঁড়িয়ে সারিকা বললো, ওকে। কথা দিলেন কিন্তু !

(২)

একজন মানুষ সম্পর্কে আর একজন মানুষ কতটুকু জানতে পারে ? বাইরে থেকে দেখে শুনে যা মনে হয় একজন মানুষ কি শুধুই তা-ই ? এক-জন মানুষ কি আসলেই একজন মানুষ ?—নাকি বহু রঙ ও পাথরের বিন্যাসে সজ্জিত মোজেকই একজন মানুষের সঠিক স্বরূপ ! তাও বাইরের পালিশ করা রূপে। মানুষের অন্তরালে যে-মানুষ সে তো অগোচরই থেকে যায়।

অবিন সম্পর্কে রাহুলের এ-কথাই মনে হলো। তারপরেই একে একে সাজালো ও ক'জন অবিনকে চেনে।

এক, ক্রিকেটার অবিন। চমৎকার ফাস্ট বোলিং করত। রাহুল তখন নামী ওপেনিং ব্যাটসম্যান। অবিন ওর চাইতে চার-পাঁচ বছরের ছোট। ও যখন মেডিক্যাল কলেজে ফোর্থ-ইয়ারে, অবিন সবে কলেজে ঢুকেছে। কিংবা হয়তো সেকেণ্ড ইয়ার। সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্য। মাসলম্যান নয়, কিন্তু শক্তিধর। খলখল হাসে। অনর্গল কথা বলে। দু'জনে বন্ধু হতে দেরি হয়নি। সকলের বিশ্বাস ছিল, টেস্টে নাহলেও বাংলা দলের হয়ে অবিন মুখার্জি খেলবে।

খেলেনি। পরের বছর আর মাঠে যায়নি।

দুই, গায়ক অবিন। একে রাহুল আচমকা আবিষ্কার করে! পাড়ার বিজয়া-সম্মেলনীতে রাস্তায় আড্ডা মারতে মারতে গান শুনছিল। হঠাৎ একটা আধো-চেনা অনেকটা-অচেনা গলা কানে এলো। যার মধ্যে কিছুটা হেমন্ত মুখার্জি, অনেকখানি দেবব্রত বিশ্বাস। ও শেষ ঘোষণার জন্য কান পেতে রইলো। অবিন মুখার্জি। মাথার মধ্যে টলমল হাম্বীর রাগ—'আরো কত দূরে'—নিয়ে দেখা করে বললো, অবিন, তুমি এত ভালো গান করো!

ও বললো, ধ্যাৎ, কিচ্ছু হয়নি। ছেলেরা ধরলো তাই।

—খেলা ছেড়ে দিলে কেন?

—গান শিখতে শুরু করলাম যে। আমি একসঙ্গে দুটো কাজ পারি না।

—বিএসসি দিয়েছ?—এবারই দেবার কথা না?

—পাগল নাকি! বিএসসিতে ভর্তিই হইনি। পড়াশোনা আর ভালো লাগলো না। মাথায় গান ঢুকে গেল—এখন ঐ নিয়েই আছি। তোমার কথা বলো—হাউস-সার্জেনগিরি কেমন চলছে? খুব ইন্টারেস্টিং কী বলো। নার্সদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছ?—বলেই হা-হা হাসি। যা ওর স্বভাব দোষ।

তিন, আর্টিস্ট অবিন।

ডাক্তারি পাশের পর পশার জমানোর চেষ্টার সঙ্গে রাহুল তৎপর ছিল, মণিকার যৌবনের অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্নে। এক উদাস বিকেলে স-মণিকা অ্যাকাডেমির লনে পদচারণার সময় আচমকা অবিনের মুখোমুখি। কাঁধে ঝোলা। এলোমেলো চুল। লতাগুল্মময় মুখাবয়বে কৌতুকোজ্জ্বল চোখদুটো মায়াময়।

রাহুল বললো, তুমি এখানে!

জোর শব্দে হাসে অবিন—ম্রাণে আছি, অম্রাণেও আছি। একজিবিশন

দেখেছ ?

—না, এবার ঢুকবো।

—যাও—একেবারে শেষে আমারও দুটো ছবি আছে। যাবার সময় বলে যেও কেমন লাগলো।

—তুমি আবার ছবি আঁকছ কবে থেকে ? গান শিখছিলে যে!

—গান-ফান আমার দ্বারা হবে না বুঝে গেছি। ছবি আঁকা আমার রক্তের মধ্যে আছে, বুঝলে। দাও, একটা সিগারেট দাও—

সিগারেট ধরিয়ে মণিকাকে দেখিয়ে বললো, ইনি নিশ্চয় ভাবী—তুমি যা-তা হয়ে গেছ, ভাবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না!

তারপরেই মণিকাকে বললো, আমি অবিন মুখার্জি। গুড ফর নাথিং ভ্যাগাবণ্ড। প্রাউড ফ্রেণ্ড অব ডঃ রাহুল সেন। রাহুলের মতন আপনিও কিন্তু আমাকে একটুখানি ভালোবাসবেন।

পরিচ্ছন্ন দাঁতের কারুকার্য উন্মোচন করে মণিকা রেওয়াজকরা স্বরে বললো, আপনার কথা অনেক শুনেছি। ভাবছিলাম দেখা হলে আপনার গান শুনবো।

—গান তো ছেড়ে দিয়েছি। ছবি দেখে আসুন, পছন্দ হলে আপনার পোর্ট্রেট এঁকে দেবো।

ঐ শেষবার। তারপর, সাত বছরের ব্যবধানে রাহুল অবিনের দেখা পেলো ওরই চেম্বারে। আসলে অবিনই রাহুলকে খুঁজে নেয়।

এই অবিনের কোনো ডেফিনিশন রাহুল জানে না।

রাহুলের ঠিক মনে আছে, বছর তিনেক আগে ওর চেম্বারে শেষ ভিজিটর হয়ে আসে অবিন।

ঢুকেই বললো, তুমি তো বিরাট ডাক্তার হে। তিন ঘন্টা বসে আছি। দাও, সিগারেট দাও। আর একটু চা-ফা বলো দেখি। বসে বসে ব্লাডার পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

বিস্মিত রাহুলের প্রথম কয়েক মিনিটের জন্য 'হতবাক' শব্দটিই মানানসই। অবিনকে, এতকাল পরে দেখে খুশি হওয়াটা উচিত কিনা বুঝতে পারলো না। কিন্তু খারাপও লাগলো না। সিগারেট বাড়িয়ে চায়ের জন্য বলে ও অবিনকে একটু খুঁটিয়ে দেখলো! কত বয়েস হবে ? বত্রিশ-তেত্রিশ ? এখনই মাথায় কেন শ্বেতপ্রকোপ! ফাস্ট-বোলারের আঁটো চেহারা না-ভাঙলেও সহজেই বোঝা

যায়, একটু সাচ্ছন্দ্য ওকে সহজাত শ্রী জোগাবে। গায়ের রং-চটা সার্টটা কি এক-সাইজ বড়ো ?

—হঠাৎ এখানে—

—হঠাৎ কী হে ! কত ঘোরাঘুরি করে, কত বেড়া টপকিয়ে, কত চেষ্টা করে তবে তোমার কাছে আসা। তোমার তো ভীষণ নাম। আমাদের পাড়ার ডাক্তার তোমার নাম করতেই বুঝে গেলাম, মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড। চলে এলাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে, গলা নামিয়ে অবিন বললো, আমি কিন্তু তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি। কিন্তু ভাই, তোমার ফিজ্‌ আমি দিতে পারবো না। আর কাজটাও তোমাকে করতে হবে।

—ফিজের কথা থাক, কাজটা কী বলো।

—আমার বউকে একবার দেখতে হবে। পাঁচ বছর ম্যারেড, নো ইস্যু। খেয়া একেবারে অস্থির অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ডাক্তার-কবরেজ-মানত-মাদুলি সব হয়ে গেছে। তা তুমি টপ ম্যান একবার দেখে দাও। সব ল্যাঠা চুকে যাক।

'টপ-ম্যান' শব্দটি রাহুলকে তৃপ্ত করে। ওর সফলতা তাহলে নিছক আত্মরতি নয়। মাত্র গুটি কয়েক সার্থক কেসই তাকে খ্যাতি এনে দিয়েছে—যা আপাতত ক্যামাক স্ট্রিট থেকে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। খ্যাতির সঙ্গে শ্যামযমজের মতন আসে অর্থ। কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ডোনার পেলে রাহুল নিঃসন্তান শব্দটিকে মুছে দিতে পারবে। প্রতিটি দম্পতিকে সৃষ্টিশীল, ফলপ্রসূ হবার গৌরব এনে দেবে। যদি অবশ্য—একটা 'যদি'-র মীমাংসা এখনো ও করে উঠতে পারেনি।

রাহুল বললো, তোমার স্ত্রীকে দেখার আগে তোমাকে জানা দরকার। আগে বলো, কী করছ আজকাল ? ছবি আঁকা—গান—কোনটা নিয়ে আছ ?

কোনোকিছুই নিয়ে লেগে থাকার মানুষ নয় অবিন। ও চেষ্টা করে কিছু না-নিয়ে থাকার। সেজন্য গান বা ছবি-আঁকা বা অন্য কিছুই দাঁতে দাঁত চেপে ভারোত্তলকের মতন সদম্ভে দেখাতে পারবে না। সফলতা মানে তো ওই—কে কতটা ওজন তুলতে পারে। মাপটা কখনো কেজিতে, কখনো টাকার অঙ্কে হাজারে-লক্ষে। অবিনের মাপ কেবল ছেড়ে দেওয়ায়, ফেলে যাওয়ায়। ও হাত মুঠো করতে শেখেনি।

তবু বেঁচে থাকার দায় আছে, দাবি থাকে। নানারকম চাকরি করেছে

বিভিন্ন সময়ে। স্থিতু হয়নি কোথাও। টাকার জন্য, অনিয়মিতভাবে, গান বা ছবি-আঁকার টিউশনি করে। ছোটরা শেখে। বড়রা দেখে, শোনে, টাকা দেয়। অবিন বেঁচে থাকতে পারে। একেবারে টাকাহারা হয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষিত কৌশলটা শিখতে পারেনি।

—স্ত্রীর সঙ্গে আটকে আছ না!

হ্যাঁ, ঐ একটাই অবিনের সফলতা। মানে, দেখাবার মতন। আসলে যা ওর একমাত্র সফল বিফলতা। এভাবে সম্পূর্ণভাবে বিফল হতে—টোট্যাল ফেইলিওর—জীবনে আর কোনো ক্ষেত্রে পারেনি।

—তাহলে করেছিলে কেন?

মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন! মানুষ কেন বিয়ে করে? অসহায়তার জন্য। খেয়ার প্রতি আনুগত্যে, খেয়ার শরীরের টানের কাছে অবিন অসহায়। অবিনের টানও খেয়াকে নিশ্চয় অসহায় করেছিল। নামী অফিসে ভালো চাকরি খেয়ার। অবিনের খেয়াল মেনে, সহ্য করে, দাবি মিটিয়ে খেয়া এখন ক্লান্ত। রোমাঞ্চহীন এক খেলা—জীবনযাপন—বিস্বাদ! একটি সন্তান নতুন খেলার সূত্রপাত ঘটাবে। এবং দেবে সেই সফলতা যা প্রতিটি নারী কামনা করে, একটি কুৎসিত বিশেষণ—বন্ধ্যা—দ্বিতীয় ত্বকের মতন যাতে জীবনকে জড়িয়ে না-থাকে।

অবিন বললো, সংসার খেয়াই চালায়। আমি নিজের খরচের টাকাটা কোনোরকমে তুলে নিই। খেয়ার কাছে হাত পাতি না। পারি না সেটা। তবে খেয়ার বাতিক আছে জিনিষ কেনার, বেড়াবার। সেজন্য কখনো কখনো কিছু বাড়তি টাকা আমাকে জোগাড় করতেই হয়।

রাহুল প্রশ্ন করে, তুমি নিজেকে টেস্ট করিয়েছ?

—হ্যাঁ। এই দেখ রিপোর্ট। সব নিয়ে এসেছি।

রিপোর্ট দেখে রাহুলের কপালে ভাঁজ পড়ে। অত্যন্ত সুস্থ, স্বাভাবিক। সন্তান না-হবার কোনো কারণ নেই। তাহলে?

খেয়ার রিপোর্টগুলো দেখে রাহুল উত্তর পেয়ে যায়। অবিন ত্রুটিহীন। কিন্তু খেয়ার শরীরে একাধিক অস্বাভাবিকতা। ঠিক সেই 'যদি'—যার মীমাংসা ও জানে না। তবু একবার দেখা দরকার—বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসায়।

দেখেছিল। একবার নয়, অনেকবার। এভাবেই পরপর দেখে অবিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। অবিনকে বোঝার চেষ্টা করে অজানা-দেশ আবিষ্কারের আনন্দ পায় রাহুল। সরল, উদাস, হাস্যময়, মনোমুগ্ধকর। এবং দুরন্ত

বিস্ময়ের।

সব অনুসন্ধান শেষে রাহুলকে চূড়ান্ত রায় জানাতেই হয়—না, অবিন, খেয়া কখনো মা হতে পারবে না। আয়্যাম সরি!

অবিন বললো, আমি জানতাম। তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। কিন্তু একটা উপকার তোমাকে করতেই হবে।

—বলো।

—তুমি খেয়াকে বলবে, ও ঠিক আছে। দোষ আমারই। মানে—আমিই —অক্ষম—

—বুঝেছি। কিন্তু কেন?

কাতর গাঢ় স্বরে অবিন বলে, ভ্যাখো, আমি সারাজীবনে ওকে কিচ্ছু দিইনি, দিতে পারবোও না। আমি একটা ব্যর্থ মানুষ—অক্ষমতার গ্লানি আমাকে মানিয়ে যাবে। কিন্তু খেয়া ঐ নিষ্ঠুর সত্যটা সহ্য করতে পারবে না। ব্যর্থতাকে ও ঘৃণা করে। আমি জানি না, রাহুল, আমি হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারছি না—কিন্তু প্লীজ, আমাকে এটুকু দয়া করো—ওকে বলো আমিই স্টেরাইল—

বিস্ময়ের সঙ্গে রাহুল অবিনকে দেখছিল। ওকে আরো বেশি রহস্যময় লাগে। এ কেমন পুরুষ যে স্বেচ্ছায় পৌরুষহীনতার গ্লানি স্বীকার করে নিতে চায়। রাহুল জানত না আরো বিস্ময় বাকি আছে।

রাহুল বললো, তা না হয় বললাম। কিন্তু খেয়া তো জানে আমি আর্টি-ফিশিয়াল ইনসেমিনেশন—কৃত্রিম গর্ভাধান—করে থাকি। খেয়া যদি তা করতে বলে—ওর ক্ষেত্রে তা করা যাবে না—

বাধা দিয়ে অবিন বললো, খেয়া চাইবে না তা। ও আমারই সন্তানের জননী হতে চেয়েছিল। শুক্র-ঋণ ও নেবে না। ব্যর্থতার মতন ঋণও ওর কাছে ঘৃণ্য।

—তোমার সম্পর্কে তো একটা ভুল ধারণা থাকবে যার ফলে অশান্তি হতে পারে।

—তা হবে। আমাকে আরো গালাগাল দেবে। কিন্তু ছেড়ে যাবে না।

—কেন?

—আমাকে ত্যাগ করলে, বা আমি যদি ত্যাগ করি, ও হেরে যাবে! সব

জেনেও খেয়া আমাকে বিয়ে করেছে জাস্ট টু প্রুভ হার ওয়ার্থ এ্যাণ্ড লাভ।... সে তুমি বুঝবে না। একটাই প্রবলেম, আমাকে একটু বেশি টাকা রোজগার করতে হবে।

—কেন ?

—খেয়া আরো জিনিশ কিনবে, বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে চাইবে। বেশি-বেশি বেড়াতে যাবে। এইসব আর কী! সেজন্য টাকা তো লাগবেই।

বলেই গলা নামিয়ে মৃদু কৌতুকে বললো, প্রয়োজনে ধার-টার দিও ভাই। শোধ করে দেবো ঠিক।

অবিনের কথামতনই খেয়াকে বুঝিয়েছিল রাহুল। খেয়ার পাশে অবিন মাথা নিচু করে বসেছিল। সব শুনে খেয়া যে-দৃষ্টিতে অবিনের দিকে তাকিয়েছিল, রাহুল তার অর্থ করে—বাইরে ফোঁপরা জানতাম, ভেতরেও ফোঁপরা তুমি !

ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল রাহুলের। অবিনের জন্য।

এক মিনিট চুপ থেকে খেয়া অবিনকে বললো, তুমি একটু বাইরে যাও তো! ডঃ সেনের সঙ্গে আমার কথা আছে।

অবিন বেরিয়ে গেলে খেয়া বললো, সত্যিই কিচ্ছু করার নেই ডঃ সেন ? বিদেশে গেলে ?

—না বিদেশে গেলেও কিছু করা যাবে না।

ডুকরে উঠলো খেয়া, এখন ওকে নিয়ে আমি কী করি !

রাহুল বললো, আপনি যদি চান, অবিন যদি রাজি থাকে, আর্টিফিশিয়ালি—

—না—না—না।—ভেজা চোখে খেয়া বলে, আমি জানি, ও রাজী হবে আমার জন্য—কিন্তু আমি চাই না। আমি তো ওর জন্যই চেয়েছিলাম। আপনি ওর বন্ধু—জীবনে ও কিচ্ছু করলো না, আমি চেয়েছিলাম, অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে ও সফল হক—এইটুকুও যদি ও পেতো! এমন টোট্যাল ফেইলিওর নিয়ে ও কী করে বাঁচবে বলুন তো ? আমি যে কী করবো—

খেয়া আবার ভেঙে পড়ে। একটু পরে নিজেকে সামলেও নেয়।

বলে, ডঃ সেন, আপনি ওকে একটু বোঝাবেন—ও যেন ভেঙে না পড়ে। ও যেন আমার জন্য কষ্ট না পায়—আপনি ওকে একটু দেখবেন—

রাহুল বিহ্বল বোধ করে। অবিন ও খেয়ার পরস্পরের জন্য চিন্তা, উদ্বেগ, আকুলতা, সংশয় ওকে স্পর্শ করে গভীরে। অথচ তবু দুজনের মধ্যে কোথাও যেন একটা নিশ্চিত ফাঁক আছে। ফাঁক, না ফাঁকি? যাই হক, ওদের অন্তর্গত সেতুবন্ধনের স্থপতি রাহুল হতে পারবে না কখনো। যে-নারীর সন্তান-ধারণক্ষমতা নেই তাকে মাতৃত্ব উপঢৌকন দেবার ঈশ্বর-শক্তি রাহুলের অনায়ত্ত। এটা সেই 'যদি'—যার কাছে রাহুল এখনো নতজানু।

মাস চারেক পরে এক সন্ধ্যায় অবিন এলো আবার। একটু বেশি-জলা মুখ। চোখে ক্লান্তি।

খুবই বিনীত নম্রস্বরে বললো, ডাক্তার, হাজার খানেক টাকা দিতে পারো! দু'এক মাসের মধ্যেই শোধ করে দেবো।

রাহুল বললো, শোধের কথা পরে—ব্যাপারটা কী বলো।

—খেয়াকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। বায়না ধরেছে রামেশ্বরম্—কন্যাকুমারী যাবে, হঠাৎ করে অত টাকা কোথায় পাই বলো!

আগেই ভেবেছিলো রাহুল, কিন্তু বলেনি। তখন বলার সময় ছিল না। অথচ ডোনার হিসেবে অবিন খুবই যুৎসই। ওর পারিবারিক পরিচয়, সামাজিক ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা। জাতকৌলীন্যও আছে। শুক্র-ঋণ নেবার সময় স্বাস্থ্য-সজীবতার সঙ্গে এগুলোও বিচার করতে হয়। অবিন রাজী হলে উভয়েরই সুবিধে।

দ্বিধা কাটিয়ে রাহুল বললো, অবিন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। যদি রাজী হও তোমার টাকার সমস্যা মিটতে পারে। অথচ তোমাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসবে। আমি ছাড়া কেউ জানবেও না। আমি চেষ্টা করবো তোমাকে যাতে বেশি টাকা দেওয়া যায়।

অবিন অবাক। ডাক্তার বলে কী! বিশেষ কিছু না-করেই বেশি টাকা! টাকা কি ছড়ানো আছে? চাকরি নয়তো? চাকরি ও করবে না।

—আমাকে কী করতে হবে?

—ডোনেট ইওর সিমেন।

বলতে যাচ্ছিল, সেল ইওর সিমেন। সেল কথাটা রূঢ় শোনাবে তাই ডোনেট বললো। বলেই রাহুল চুপ করে থাকে। কথাটা অবিন যাতে মগজে সঠিক-ভাবে ধরে নিতে পারে তার সুযোগ দেয়। অবিন কথাটা মাথায় নাড়াচাড়া

করতে করতে বাক্‌হীন তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের দিকে।

রাহুল বলে, গ্যাখো, আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনে ডোনার তো লাগে—যার সিমেন—বীর্য—আমরা নারী-শরীরে নিষিক্ত করি। ডোনার নির্বাচনের সময় আমাদের অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়। সমতুল পারিবারিক সামাজিক পরিচয়, শিক্ষা, স্বভাব, স্বাস্থ্য—ইত্যাদি। আমি যে সব পেশেন্ট পাই তাদের জন্য, য়ু আর দ্য রাইট পারসন্‌! তাছাড়া কনফিডেন্স এবং সিক্রেসিরও একটা ব্যাপার আছে। আমরা বন্ধু। আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি, নির্ভর করতে পারি। অবশ্য তোমাকে কিছু কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে।

ডাক্তার কি সিরিয়াস? এও কি হয়! বীর্য-বিক্রয়? অবিন মুখার্জি শেষে কিনা বীর্য-শুল্ক আদায় করবে! পণ্য শুক্র থেকে অর্থোপার্জন? জীবন কি ভীষণ অজানা!

হা-হা-শব্দে হেসে উঠলো অবিন। সে-হাসির ধারালো শব্দে ডাক্তারের মহার্ঘ চেম্বার কেঁপে ওঠে। কাচের জানালায় করতাল বাজে।

—অবিন!

হাসি থামে না ওর। হাসতে হাসতে হাতের সিগারেট ছিটকে পড়ে সার্টে। টেরিকট। মুহূর্তেই পুড়ে কালো গোল ছিদ্র হয়। অবিন থামে। সার্টের পোড়া দাগটা দ্যাখে।

রাহুল বললো, মানবিক দিকটাও ভেবে গ্যাখো। তোমার শুক্র-ঋণ নিয়ে অনেক নারী যারা মা হতে না পারায় খেয়ার মতনই দুঃখী, তারা সুখী হবে। অনেক দম্পতি জীবনে আনন্দ খুঁজে পাবে! তোমার দানে—

ভুরু কুঁচকে অবিন বললো, বড়োবড়ো বানানো কথাগুলো বলো না তো! শর্তের কথা কী বলছিলে যেন?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাহুল বললো, খুবই সাধারণ শর্ত। আমি যখন বলবো আসতে হবে। প্রতিটি কেসের জন্য পরপর তিনদিন অন্তত। ডোনেট করার আগে পাঁচ-সাতদিন নো সেক্স। এ্যাণ্ড, কক্ষনো জানতে চাইবে না রেসিপিয়েন্ট কে। তোমায় যা কিছু লেনদেন কেবল আমার সঙ্গে।

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সিমেন্‌ তোমাকে দেবো কী ভাবে?

—নির্দিষ্ট সময়ে এসে, মাস্টারবেট করবে। টিন-এজের অভ্যাস নিশ্চয় ভুলে যাওনি। কালেক্ট দ্য সিমেন ইন আ টেস্ট-টিউব—এ্যাণ্ড ছাটস অল। বাকি সব আমার ব্যাপার।

দুষ্টু হেসে অবিন বললো, এত ঝামেলার কী দরকার। স্ট্রেট দিলে হয় না—স্বাভাবিক ইনজেকশন?

রাহুলও হাসলো—খুব মজা হয় তাহলে? ঐ জন্যই শর্তগুলো। এ্যাণ্ড য়্যু নো দ্যাটস ইমপসিবল। ইনসেমিনেশন আর ইনটারকোর্স এক নয়।

শেষ পর্যন্ত অবিন রাজি হয়েছিল। প্রথমবারেই রাহুল ওকে এক হাজার টাকা আদায় করে দেয়। তারপর যখনই বেশি টাকার দরকার হয়েছে, ও এসেছে। কিন্তু কেবল টাকা-রোজগারের জন্যই আসেনি। বহুবার রাহুলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। বিনা-প্রয়োজনে নিজেকে বিক্রি করতে ও ইচ্ছুক নয়। প্রতি শুক্র-বিন্দুতে নিজের অস্তিত্বের সূক্ষ্মাংশ থাকেই। প্রতি 'দানে' অনেকখানি আত্মধিক্কারও কি মিশে থাকে না? তিন বছরে তাই অবিন মাত্রই পাঁচবার বীর্যশুল্ক আদায় করেছে। প্রতিটি আদায়ের নিলাজ দীনতার সঙ্গে সরস কৌতুক মিশিয়ে হেসেছে।

রাহুল জানে অবিন খুব ভালো ডোনার। প্রতিটি শর্ত বিশ্বস্তভাবে মেনে চলে। ওর প্রতিটি 'দান'-ই হয়েছে ফলপ্রসূ।

সারিকা বসু তার চতুর্থ গ্রহীতা।

(৩)

গভীর অভিনিবেশে সারিকা সমস্ত শুনেছিল। শুনতে-শুনতে চেষ্টা করছিল, অবিনের চেহারা কল্পনা করার। নানা রকম কল্পনার মূর্তি চোখে ভাসে। কোনোটাই পছন্দ হয় না। এমন মানুষ যে টাকা অবহেলা করে, যে স্বেচ্ছায় গ্লানি মেখে নেয় গায়ে স্ত্রীর কথা ভেবে, আবার সেই স্ত্রীর জন্যই শুক্র পণ্য করে অর্থার্জন করে, দীনতার লজ্জা হেসে উড়িয়ে দেয়—এমন মানুষকে কল্পনায়ও ধরার সাধ্য নেই সারিকার। অলৌকিক অবয়ব কল্পনায় আসে না। অথচ এক প্রবল দুঃখবোধ, নাকি মমতা, সারিকার অনুভব তোলপাড় করে। কী দুখী মানুষ এই অবিন মুখার্জি! পাঁচটি সন্তানের জনক, অথচ নিজের একটিও সন্তান নেই। নিজের অভিজ্ঞতায় খেয়ার দুঃখ যন্ত্রণা ও বোঝে। অবিনের দুঃখ বোধাতীত।

নিজের ভেতরে উথলে-ওঠা আবেগ সামলে নিয়ে সারিকা বললো, ডঃ সেন, কবে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে?

—আপনি এখনো ওকে মিট করতে চান ?

দ্বিধাহীন কণ্ঠে সারিকা বলে—হ্যাঁ।—মনে মনে বলে, এখন আরো বেশি করে চাই।

—আমার শর্তগুলো মনে আছে, মিসেস বোস ?

—আছে। কথা দিচ্ছি, আমি ওঁকে কিছু বলবো না। আমার দিদির মেয়ে থাকে আমার কাছে। বলবেন ওকে গান ও ছবি আঁকা শেখাবার জন্য টিউটর খুঁজছি।

সহর্ষে রাহুল বললো, ওরে বাব্বা! আপনি এতদূর ভেবে রেখেছেন!··· ঠিক আছে, বসুন তাহলে। আজ ওর আসার কথা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে। ততক্ষণে এক কাপ কফি নিশ্চয় চলতে পারে।

কফি খেতে-খেতে রাহুল নিজের কাজ সারে। মাঝে মধ্যে দু'একটা মামুলি প্রশ্ন করে। সারিকা জবাব দেয়। রাহুল ওর ঈষৎ অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেও কিছু বলে না। সারিকা একান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে অবিন নামক অলৌকিক অস্তিত্বের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। রাহুল সেন জানে না, কল্পনাও করতে পারবে না, মিথ্যে বন্ধ্যা অপবাদে কী নিদারুণ নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা সারিকা মুখ বুজে সহ্য করেছে। উদ্ধত অহঙ্কারের চূড়া থেকে মৈনাক বসুকে নামিয়ে আনা সরল ব্যাপার ছিল না। রাহুল সাহায্য করেছে ঠিক, ক্ষতবিক্ষত যুদ্ধ করতে হয়েছে সারিকাকেই। এখন প্রকাশ্যে মৈনাকের গর্বিত পিতা-মুখ দেখে হাসিই পায়। সে-হাসি সারিকার অতি নিজস্ব। সে-হাসির রূপ কেউ জানে না।

—কী খবর ডাক্তার, অধমকে তলব কেন—

বলতে বলতে ঘরে ঢোকে অবিন, এক সুরেই বলে যায়, সিগারেট দাও—আর একটু চা—

চা-শব্দটি ওর গলায় আটকে যায়। রাহুলের বিশাল টেবিলের উল্টোদিকে, ডানদিকে, সারিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করে।

তৎক্ষণাৎ নম্র স্বরে বলে, স্যরি, ডাক্তার। বুঝতে পারিনি তুমি ব্যস্ত আছ। আমি বাইরে—

রাহুল হাত তুলে বললো, বসো, বসো। আমরা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। ইনি মিসেস সারিকা বোস—আর মিসেস বোস, এই হচ্ছে অবিন—অবিন মুখার্জি, যার কথা আপনাকে বলেছি।

হাত জোড় করে নমস্কার করে অবিন বসে। সিগারেট ধরায়।

—চা-টা হবে?

—আমরা এক্ষুনি কফি খেলাম। তোমার জন্য আনছে।

সারিকা ঠোঁটের ভাঁজে জিজ্ঞাসু হাসি উজিয়ে রেখে অবিনকে জরীপ করে। লম্বা চেহারার শক্ত কাঠামো, রোদে-পোড়া চামড়া ফর্সাই ছিল নিশ্চয়। মাথাভর্তি লম্বা চুল—সাদাকালো, এলোমেলো। জুলপির নিচে ঘাম। ইটরংয়ের হাওয়াই সার্টের নিচে সবল পেশী চঞ্চল। চোখ দুটো উদাসীন—বিষণ্ণই মনে হলো সারিকার। অল্প ভারি ঠোঁটের আড়ালে দাঁতগুলো স্বাস্থ্যদীপ্ত। টেরিকটের প্যান্টটা দীর্ঘকাল লণ্ড্রির সেবা পায়নি।

কফিতে চুমুক দিয়ে অবিন বললো, বলো কি ব্যাপার?

রাহুল বললো, মিসেস বোস তাঁর দিদির মেয়ের জন্য গান ও ছবি আঁকার মাস্টার খুঁজছেন। আমি তোমার কথা বলেছিলাম। সেজন্যই উনি অনেকক্ষণ এসে বসে আছেন।

সৌজন্য বিনিময়ের পর প্রথম চোখ তুলে সারিকাকে দেখলো অবিন। এমন সশস্ত্র সুন্দরী ও বেশি দেখেনি। চোখে ঝাঁঝ লাগে। মহিলার শরীরের কোথায় দৃষ্টি রাখবে ভেবে পায় না। মুখের হাসিটা কি প্রশ্রয়ের না পরিহাসের?

চোখ সরিয়ে অবিন বললো, কত বড় মেয়ে?

অবিনের গলার স্বর ভরাট, ললিতছন্দময়। সারিকার বারবার শুনতে ইচ্ছে করে।

—ভানিয়া এবার আটে পড়লো।

—যাক বাঁচা গেল। দশের বেশি বয়েসী ছেলে-মেয়েদের আমি শেখাই না।

—কেন?

—দশের বেশি হলে শিশুরা শিশু থাকে না। আর শিশুরা ছাড়া আমাকে কেউ সহ্য করে না।

শব্দ করে হেসে ওঠে সারিকা। রাহুলও হাসে।

অবিন বলে, তুমি এঁকে আমার স্বভাব-চরিত্রের কথা বলেছ?

রাহুল মাথা নাড়ে।

—শুনুন মিসেস ঘোস, আমি গোড়াতেই বলে রাখি, তানিয়ার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ঠিক না হলে কিন্তু আমি শেখাবো না। আর আমি বাই নেচার বাউণ্ডুলে—ঘড়ি ধরে, দিনগুণে, প্রতি সপ্তাহে যেতে পারবো না। আমার যেমন ইচ্ছে হবে যাবো, যতক্ষণ ইচ্ছে শেখাবো—অবশ্যই অসময়ে নয় বা কারো কোনো অসুবিধে ঘটিয়েও নয়। এতে কি রাজী হবেন আপনারা ?

সারিকা আবিষ্ট হয়ে শুনছিল। কী সরল, খোলামেলা-ভঙ্গি। কণ্ঠস্বরে অমল মাদকতা। অর্থকরী বিষয়ে কেউ এমন হেলাভরে কথা বলতে পারে নাকি ? কিংবা হয়তো অবিনের নিজস্ব কোনো অহঙ্কারই তাকে আর সবকিছু তুচ্ছ করতে প্ররোচিত করে। এতক্ষণের মধ্যে একবারও অবিনের চোখে সেই দৃষ্টি দেখেনি যা ও সমস্ত পুরুষের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। রাহুল সেনের ডাক্তারি আঙুলের লোলুপ সংস্থান ও নির্ভুল চিনেছিল।

ঠোঁট টিপে সারিকা বলে—রাজী।

তারপরই রাহুলকে উদ্দেশ্য করে বলে—ওঁর রেমুনারেশন—

হা-হা হেসে ওঠে অবিন, যা ওর স্বভাবদোষ। হাসতে হাসতেই বলে—আগে তানিয়াকে দেখি, শেখানো শুরু করি। ভালো লাগলে যা-খুশি দেবেন। আমার ভালো না-লাগলে আমি যাবো না। ব্যস !—ত', আপনার বোনঝি থাকে কোথায় ?

—আমার কাছেই। ময়রা স্ট্রিটে। আমাদের ফ্ল্যাটে।

—ময়রা স্ট্রিট—সেতো দারুণ বড়লোকী ব্যাপার। আমার মতন মানুষকে মানাবে ?

বলেই আরেক দফা হো হো হাসে অবিন।

সারিকা ভাবে, এমনভাবে যে হাসতে পারে তার মধ্যে কোনো মালিন্য থাকে না।

(৪)

বিশাল অভিজাত ফ্ল্যাটে ঢুকে প্রথমযে সামান্য অস্বস্তি হয়েছিল অবিনের সারিকার শাণিত চোখ ঠিকই তার হদিশ পায়। ফ্ল্যাটটা এত বেশি সুন্দর করে সাজানো যে অনভ্যস্ত দৃষ্টি পীড়িত হবেই। কিন্তু মৈনাক বসুর ফ্ল্যাট এর চেয়ে কম

সাজানো হলে চলে না। তবে অবিনের অস্বস্তি চকিতের। অল্প সময়েই ও সহজভাবে নিজেকে মানিয়ে নেয়। আরো সহজভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে তানিয়ার সঙ্গে।

পরিচয়-পালা সাঙ্গ হতেই অবিন ওকে কোলের কাছে টেনে পিঠে স্নেহের হাতে জড়িয়ে বলে, আমাকে অবিনকাকু বলবে, তুমি আমার তানিয়া আম্মা।

আসলে বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে যাবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে অবিনের। চারমাসের শেষে, তানিয়া এখন অবিনকাকু আসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

অবিন নিজের স্বভাবমতনই আসে যায়। কোনো সপ্তাহে পাঁচদিনই এল। আবার এক সপ্তাহ হয়তো এলই না। কোনোদিন এক ঘন্টা থেকেই চলে যায়। আবার কখনো চার-পাঁচ ঘন্টাও হেসে গেয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু মন দিয়ে শেখায়। আদর করে, ভালোবেসে, কচিৎ কখনো শাসন করে। শেখানোর ভঙ্গিটা এমন যেন ওটাই ওর জীবনের সাধনা।

ওর আসা-যাওয়া, শেখানো গল্প করার প্রতিটি মুহূর্ত সারিকা তার প্রখর উপস্থিতি দিয়ে ঘিরে রাখে। অবিন নিখুঁত নম্র সৌজন্য প্রকাশ করে। একবারও চোখে চলকে ওঠে না লোলুপ-দীপ্তি। ওর উদাসীন দৃষ্টির কাছে সারিকার নশ্বর রূপ অসহায়। কত বিচিত্র শ্লীলতাসম্ভব মোহনীয় লোভনীয় সাজে ও নিজেকে হাজির করেছে অবিনের সামনে, একবারও অবিনের চোখে বিভ্রমের ছায়া কাঁপেনি।

প্রথম মাসে পারিশ্রমিক হিসেবে পাঁচশ টাকার খাম নিজের হাতে দিয়েছিল সারিকা। পরদিনই অবিন তিনশ টাকা ফেরৎ দিয়ে বলেছিল, আপনারা ভুল করেছেন। আমি অত দামী মানুষ নই।

সারিকা বাক্যহারা হয়ে যায়। ও ভেবেছিল হাজার টাকাই দেবে কিনা। প্রথমবারে বড্ড বাড়াবাড়ি হত বলে পাঁচশ দিয়েছিল। এ কেমন মানুষ যে প্রাপ্য টাকাও ফেরৎ দেয়!

কত কী ওকে দিতে ইচ্ছে করে। অবিন্যস্ত জামা-কাপড় দেখে কতবার ভেবেছে নতুন পোশাক কিনে দেয়। সাহস করে বলতে পারেনি। ভেবেছে পুজো বা জন্মদিন উপলক্ষে একসঙ্গে করে দেবে। কিন্তু যে পরিশ্রমের টাকাও ফেরৎ দেয় তাকে আর কিছু কি দেওয়া যাবে!

—আপনার টাকার দরকার নেই ?

—আছে বলেই তো দুশো নিলাম। ঐ যথেষ্ট।

—তাহলে আপনি মাস্টারি করেন কেন ?

—প্রথমত আনন্দের জন্য। দুই প্রয়োজন। প্রয়োজনের বেশি আমার কিছু চাই না।

আরেকদিন সারিকা বলেছিল, অবিনবাবু, আপনার কিছু করতে ইচ্ছা করে না—যেমন ধরুন ভালো চাকরি বা কোনো বিজনেস—

অম্লান হেসে অবিন জবাব দেয়—না।

—আপনি জীবনে কী চান তবে ?

—শুধু আনন্দ। আমি সারা জীবন চেষ্টা করে যাচ্ছি কিচ্ছু না হতে, কিচ্ছু না করতে।

—বুঝলাম না।

—বুঝবেন না। কেউই বোঝে না। তবু বলছি—আপনি যখন কোথাও বেড়াতে যান, সেখানে কি আপনি কিছু হতে বা কিছু করতে চান ? না কেবল আনন্দ চান ?

—আনন্দই চাই।

—সে-কথাই বলছি। এই পৃথিবীতে আমাদের বেড়াতেই আসা। যতক্ষণ আছি আনন্দে থাকতে চাই। কিন্তু এত বাধা—পারা বড়ো কঠিন।

—কিসে আনন্দ পান আপনি ?

—একেক সময় একেক জিনিসে। এখন যেমন শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে, নদীর ধারে বসে থাকতে, ঘুরে বেড়াতে, ইচ্ছামতন ছবি আঁকতে, মাঠের মধ্যে একলা গান গাইতে আর—

—আর ?

—কখনো কখনো মদ খেয়েও খুব আনন্দ পাই। সেজন্যই যা একটু টাকা-পয়সার দরকার।

—কী কাণ্ড! আপনি ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন বলেননি কেন! না, আমারই অফার করা উচিত ছিল। কী খাবেন বলুন।

—না, মাপ করবেন। এখানে ওসব চলবে না আমার। তার জন্য আলাদা সময় আছে, জায়গা আছে। আসলে আমার স্ত্রী আর সব উপদ্রব মেনে নিলেও এ ব্যাপারটা সহ্য করেন না। তাই এই আনন্দের জন্য আমি মাঝে মাঝে বাইরে

চলে যাই।—বলেই হা হা হেসে ওঠে। যেমন স্বভাব।

যত চেষ্টা করে সারিকা ওর কাছে যাবে, অবিন আরো দূরে সরে যায়। অথচ এই মানুষটাই ওর সন্তানের জনক। কল্পনা করার চেষ্টা করে অবিনের সঙ্গে বিয়ে হলে জীবনটা কেমন হতো। জীবন কাটাতে পারত কি এমন এক উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের সঙ্গে? একবার মনে হয়—পারত। পরেই আবার মনে হয়, না। যাকে হাতের মুঠোয় ধরা যায় না, তার সঙ্গে সহবাস সম্ভব হলেও জীবন-যাপন সম্ভব না। একেকবার খেয়ার কথাও ভাবে। ও কীভাবে অবিনের সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে? রাহুলের বলা কথাগুলো মনে পড়ে—'আমি যেকীকরবো ওকে নিয়ে—খেয়া ওর মধ্যে কী পেয়েছে? অবিনও এমন খেয়া-পাগল যে, সারিকার দুর্দ্ধর্ষ যৌবনও সাবলীল তাচ্ছিল্য করে। খেয়া কি আরো সুন্দরী?

কয়েকদিন পরে, তানিয়াকে শিখিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে অবিন! সারিকা সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আপনার খুব তাড়া আছে?

—না। কেন?

—আপনি তো আমার মেয়েকে দেখেননি! একটু বসুন। এখনই নিয়ে আসছি।

সোফায় বসে অবিন সিগারেট ধরায়। দেয়ালে অরিজিন্যাল প্রকাশ কর্মকার। নকল ভ্যান গগ, রুবেন। ও কি কখনো প্রকাশের মতনও আঁকতে পারবে। অধ্যবসায় স্বভাবে নেই। সেজন্যই কিছু হওয়া বা করার ইচ্ছা ও রাখে না।

যে-কোনো সুন্দরীর কোলে ফুটফুটে বাচ্চা দেখলে ম্যাডোনার কথা মনে আসবেই। কোলে বাচ্চা নিলেই নারী আর নারী থাকে না—মা হয়ে যায়। সারিকার মুখর শরীরের দিকে তাকাতে এখন একটুও কষ্ট হয় না।

—ভারি সুন্দর মেয়ে তো আপনার! কী নাম রেখেছেন?

—সিমি বলে ডাকি। ভালো নাম মূর্ছনা।

—বাঃ! দুটোই সুন্দর।

বাচ্চা দেখলেই যা হয়, অবিন হাত বাড়িয়ে দেয়। সিমি মায়ের কাঁধে মুখ গোঁজে।

অবিন ঠোঁট দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ তোলে। সিমি অবাক চোখে ফিরে তাকায়। অবিনের হাত বাড়ানো। ঐ শিশু অবিনের চোখের ভাষা বুঝে নিয়ে ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবিন ওকে নিয়ে হুটোপুটি করে।

সারিকার মুখে প্রসন্ন গর্বের হাসি। সিমি একেকবার মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। আধো আধো কথা বলে—দেড় বছরে যেটুকু বলা যায়। সারিকার কণ্ঠার কাছে একটা নিরুচ্চারবাক্য ছটফট করে—অবিন, ও তোমার মেয়ে—তোমার—

দশতলা থেকে লিফটে নামতে নামতে অবিনের অনেকবার-দেখা স্বপ্নটা মনে পড়ে। ও যেন এক দীর্ঘ টানেল পেরিয়ে যাচ্ছে। খু-উ-ব দূরে আলোর আভাস। অন্ধকারে পথ হাতড়ে যেতে যেতে ধাক্কা লাগছে। ও যত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, ততই আটকে পড়ছে।

আরো কতকাল ধাক্কা খেতে খেতে এগোবে অবিন ?

(৫)

দশ তলায় উঠে প্রতিবার যা মনে হয়েছে, আজও তাই মনে হলো। নিচে একটা অচেনা কলকাতা—অন্য পৃথিবী। ওখান থেকে এখানে বেড়াতে উঠে আসা। আবার এখান থেকে ওখানে বেড়াতে যাওয়া। নিচের আলো-হাওয়া ধুলো-গন্ধ—যা প্রাত্যহিক অস্তিত্বের সঙ্গী—এখানে নেই। এ এক বিদেশ-ভ্রমণ। ব্যাপারটা মন্দ না! এখান থেকে সন্ধ্যার কলকাতা কত মায়াবী!

কলিং বেলে মৃদু চাপ। সারিকা দরজা খুলে মোহন হাসে—আসুন।

অবিন চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়। একী সাংঘাতিক সাজ পোষাক! এমন ধারালো রূপ সহন-ক্ষমতা অবিনের নেই। ও চুপচাপ তানিয়ার পড়ার ঘরের দিকে এগোয়।

সারিকা বাধা দিয়ে বলে—উঁহু ঐ দিকে। ও ঘরে বসবেন আজ।

অবিনের চোখের জিজ্ঞাসা পড়ে সারিকা আবার বলে—তানিয়া ওর পিসির কাছে গেছে আলিপুরে।

—তাহলে বরং আমি যাই আজ।

—যাবেন কেন, বসুন। আমার সঙ্গে গল্প করতে খুব খারাপ লাগবে ?

—না—তা নয়—মানে—

—ঠিক আছে বসুন। কফি খান—নাকি ড্রিঙ্ক চলবে ?

—না-না। কফিই দিন।

—রোজই চা-কফি খান। আজ তো ছাত্রী নেই। আজ বরং ড্রিঙ্কস নিন

—হুইস্কি ?

চমৎকার নক্সা-কাটা গ্লাসে হুইস্কি-বরফ মিশিয়ে সারিকা ওর পাশের ছোট টেবিলে রাখে। অবিন খেয়াল করেনি—এক হাত দূরে উল্টো দিকের টেবিলে আরেকটি গ্লাস। সেটা তুলে সারিকা বললো—চিয়ার্স—

যন্ত্রবৎ অবিন উচ্চারণ করে—চিয়ার্স।

চুমুক দিয়েই অবিন টের পায় স্কচ—তবে বড্ড কড়া। ও আরেকটু জল মিশিয়ে নেয়।

—আপনি কী খাচ্ছেন ?

—মাই ফেভ্রিট জন কলিনস্।

—মিঃ বোসকে দেখছি না অনেকদিন।—কথা খুঁজে না পেয়ে অবিন বললো।

—আমিও দেখছি না। ঝিনঝিন শব্দে হাসে সারিকা—তিনি দিল্লিতে।

অবিন কী বলবে ভাবে। চুপচাপ এই চৌখশ সুন্দরীর মুখোমুখি বসে হুইস্কি পান ভীষণ অস্বস্তির। ভদ্রতা বজায় রেখে কীভাবে বিদায় নেবে চিন্তা করে। এই গ্লাসটা শেষ হলেই চলে যাবে। খুব জরুরী কাজের কথা মনে পড়াটা কি অস্বাভাবিক হবে ? অবিনের জরুরী কাজ থাকতে পারে বিশ্বাসই করবে না হয়তো। ও তো অকাজের মানুষ। খেয়ার অসুখ যদি বলে ?

এ ঘরের দেয়ালে সিমির অনেকগুলো এনলার্জড ফটো। কোনোটায় হাসছে। আরেকটায় হাত-পা ছুঁড়ছে। অন্য একটায় নাচের ভঙ্গি।

—কী ব্যাপার অবিনবাবু, আপনি কি প্রতিজ্ঞা করেছেন আমার দিকে তাকাবেন না—কথা বলবেন না—চাপা ঠাট্টা সারিকার স্বরে।

অবিন বললো—তা নয়। সিমির ছবিগুলো দেখছিলাম।

সারিকা সহজ হাসে—আপনি খুব বাচ্চা ভালোবাসেন!

—শিশুদের কে না ভালোবাসে, বলুন!

দরদী কণ্ঠে সারিকা বলে—ডঃ সেন বলছিলেন, আপনাদের কোনো ইস্যু নেই—

—না।

—ইচ্ছা করে না ?

—অসম্ভব ইচ্ছা করতে নেই।

—অসম্ভব কেন—ডঃ সেন তো আর্টিফিশিয়াল—

—খেয়ার ক্ষেত্রে তাও সম্ভব না। কেন, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, প্লীজ।

খুব ঠাণ্ডা গলায়, অবিনের মুখের ওপর দু'চোখের দৃষ্টি রেখে সারিকা বলে, আমি জানি।

—কী জানেন?—সন্ত্রস্তস্বরে অবিন বলে।

—জানি, য়ু আর ওকে। শী ইজ নট্!

এক ঢোঁকে গ্লাস শেষ করে অবিন উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি চলি, মিসেস বোস।

ওর গা ঘেঁসে দাঁড়ালো সারিকা। বাহুতে হাত রেখে বললো, এখুনি যাবেন কী! আরেকটা খান প্লীজ!—বলতে বলতেই টেবিলের নিচে রাখা বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দেয়। বরফ মেশায়। জল ঢালে। অবিনের হাতে গ্লাস দিয়ে বলে—প্লীজ, হ্যাভ ইট।

অসহায় অবিন ধুপ করে বসে পড়ে। গ্লাসে চুমুক দেয়। ওর মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়—রাহুল ওকে আর কী বলেছে!

সারিকা চেয়ারটা অবিনের আরো সামনে টেনে, এক হাত দূরত্বে, মুখোমুখি। সবুজে ঢাকা ডান স্তন পাহাড়ের মতন উদ্ধত। মধ্যবর্তী উপত্যকা বহুদূর বিস্তৃত। অবিন চোখ সরিয়ে নেয়।

নরম মিহিস্বরে সারিকা বললো, অবিনবাবু, ক্ষুব্ধ হবেন না। আপনি দারুণ মহৎ কাজ করেছেন। কত নারীকে আপনি কী দুর্লভ শান্তি দিয়েছেন আপনি জানেন না। এতে কোনো লজ্জা নেই, দীনতা নেই।

অবিন নিরুত্তর। গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালো, সারিকা তবে সবই জানে! ও রাহুলের ওপর রাগ করবে কিনা বুঝতে পারে না।

সারিকা দ্বিধার সঙ্গে বলে, অবিনবাবু, আমার কৌতূহল মার্জনা করবেন। আপনার সন্তানদের দেখতে ইচ্ছে করে না?

শীতল জবাব—না।

—কেন?

—আমি রক্তও দান করি। আমার রক্তে যে-রোগী সুস্থ হয় তাকেও আমি দেখতে যাই না।

—সে আপনি রোগীকে জানেন না, চেনেন না বলে।

—এক্ষেত্রেও আমি দাতাকে চিনি না।

—যদি চেনেন, তাহলে দেখতে চাইবেন—আপনার সন্তান—

—না।—অবিন আরো শীতল।

—কেন—কেন—আপনি আপনার নিজের সন্তানকে দেখতে চাইবেন না? —সারিকা ব্যাকুল আবেগময় স্বরে বলে।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে অবিন বললো— মিসেস বোস, যে-কোনো সৃষ্টির মধ্যে থাকে স্রষ্টার আবেগ, ইনভলভমেন্ট, প্রত্যাশা—তার রক্ত, তার ঘাম, তার দীর্ঘশ্বাস, তার ক্লান্তি হতাশা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা—যেখানে তা নেই তার প্রতি স্রষ্টার কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। কারণ সে স্রষ্টাই নয়। অ্যাসেমব্লি লাইন থেকে যে গাড়ি বেরিয়ে আসে তা নিশ্চয় কোনো ডিজাইনার বা ইঞ্জিনিয়ার দেখতে যায় না। ডোনেটিং সিমেন আমার কাছে ব্লাড-ডোনেটিংয়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়। যাকে আপনি আমার সন্তান বলছেন, সে আমার সন্তান নয়! সে বিজ্ঞানের সন্তান।

—নো-ও-ও-ও। আর্তনাদ করে সারিকা ঝাঁপিয়ে পড়ে অবিনের বুকে। হতচকিত অবিন কী করবে বুঝে উঠতে পারার আগেই, ওর বুকে দুমদাম কিল মারে সারিকা—এ-কথা বলো না—অবিন, এ-কথা বলো না—য়ু কান্ট সে দ্যাট টু মি!

নিজেকে সারিকার আবেষ্টনী থেকে আলগা করতে করতে অবিন বললো—না বলতে পারার তো কোনো কারণ নেই, মিসেস বোস।

চিৎকার করে সারিকা, চোখ লাল, দুই গাল ঠোঁট ফোলা—নিশ্চয় আছে। ওঃ গড! সিমি—সিমি—তোমার সন্তান অবিন। এ্যাণ্ড আয়্যাম সো প্রাউড অব দ্যাট।

গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়ালো অবিন। সারিকার বিস্রস্ত নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার নয়, সারিকা। বিজ্ঞানের।

সারিকা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অবিনের ওপর। দুহাতে জাপ্টে ওর ঠোঁট চোষে লজেন্সের মতন। সারা আঁচল মেঝেয়। সবুজ দুই বুক অবিনের বুকে মাথা কোটে।

ঠোঁট তুলে সারিকা বলে, অলরাইট। গিভ মি আ সন—আমাকে একটা ছেলে দাও—তোমার ছেলে—উইথ অল ইউর আবেগ, প্যাশন, উদ্বেগ অ্যাণ্ড হোয়াট নট—গিভ মি আ সন—অবিন, আমি তোমাকে চাই, তোমার ছেলের মা হতে চাই—আমাকে একটা ছেলে দাও—

ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দেয় অবিন—রাহুলকে বলবেন—ও আপনাকে সাহায্য করবে নিশ্চয়—

হিস হিস করে সারিকা বলে—ও! তুমি টাকার কথা ভাবছ—কত টাকা চাই তোমার—পাঁচ হাজার—দশ হাজার—আমি দেবো—বাট গিভ মি আ সন—একটা ছেলে দাও আমাকে—তোমার ছেলে—অবিন—

—কিচ্ছু বোঝেন না আপনি—

বলেই সামনের সোফার ওপর সারিকাকে সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে ফাস্ট বোলারের দৌড়ে বেরিয়ে এলো অবিন।

উত্তেজনার অন্ধকার অবিনের চোখে। লিফটের কথা মনে পড়ে না। ছুটন্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নামে। মাথা ঘোরে, সিঁড়িগুলো উথাল-পাথাল দোলে। যতদূর দেখা যায়, পুরো স্টেয়ারকেসটাকে অবিনের এক বিশাল টানেল বলে মনে হয়। ও কেবল ধাক্কা খায়। টাল-মাটাল পায়ে কত তলা ভেঙে এসেছে বুঝতেও পারে না।

টানেলের শেষে আলোর বৃত্তটা কতদূরে?

ঝুল-ঝাঁপি

রুমালে বার কয়েক ঘষেছে। তবু নস্তির হাত। ঘরে ঢোকার মুখে পাঞ্জাবীর গায়েও বার দুয়েক ঘষে নিলো। পাঞ্জাবীরও যা অবস্থা। বটব্যাল সায়েব কিছু বলেন না। তাহলেও এই পোষাকে এই ঘরে ঢুকতে তারক মরমে মরে যায়। কিন্তু উপায় কী! পাঞ্জাবীর বিকল্প যা, সে-ভাবে তো আসা যায় না —খালি গায়ে। টেবিলের সামনে বসেও দু হাঁটুর ওপরে রাখে দু হাত।

—বলো টারকবাবু, কী ব্যবস্থা করলে ?

বটব্যালের মুখে লম্বা চুরুট। সেজন্য ত ট-হয়ে উচ্চারণ হয়। সায়েবের এই বাবু বলাটা কেন তারক জানে না। ও অনেকবারই বলেছে, আমাকে তারকই বলবেন। সায়েব রাজী হননি।

—আর কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভয়ে ভয়ে বললো তারক।

—আবার সেই কথা! ছ' মাসের বেশি তুমি আমাকে এই কথা বলে আসছ। তুমি যদি না পারো সে-কথা বলো না স্পষ্ট করে।

—স্যার, আপনি আমার উপর রাগ করছেন। কিন্তু—

—না-না। না, তারকবাবু। আমি রাগ করছি না। ব্যবসার ব্যাপারে কি রাগারাগি চলে! তুমি আমার দিকটা ভেবে দ্যাখো। প্রায় এক বছর আগে বলেছি তোমাকে। তোমার ভরসায় ক্লায়েন্টকে কথা দিয়েছি। এখন যদি একটা সামান্য জিনিষ সাপ্লাই করতে না-পারি তাহলে ব্যবসারইবা কী হয়, আমার রেপুটেশনও কোথায় যায়!

—আমি বুঝতে পারছি, স্যার। কিন্তু এমন কঠিন জিনিশ, একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। নইলে, আপনি ভেবে দেখুন, আগে আপনি বলার এক মাসের মধ্যে দিয়ে গেছি ঠিক যেমনটি চেয়েছেন। সিক্সটিন উইকস এইটিন উইকস বলুন, আমি স্যার কালই আপনাকে এনে দেবো। কিন্তু থার্টি-টু

উইকস, একেবারে ফুলগ্রোন—

বাধা দিয়ে বটব্যাল বলেন, টাকাটার কথাও ভেবে ভাখো। দু'শ-পাঁচশর বদলে একেবারে তিন হাজার। ফুল-গ্রোন বলেই তো!

—না স্যার, টাকার ব্যাপারে আমার কিচ্ছু বলার নেই। আমি সব সময়ে বলি, আপনার মত দরাজ দিল, মহৎ মানুষ—

—থাক, থাক। ফাইন্যাল বলো, তারকবাবু, কবে দিতে পারবে।

নাক টেনে, গলা পরিষ্কার করে তারক বললো, একটা কেস পেয়েছি, স্যার। আগামী সপ্তাহে থার্টি-টু উইকস হবে। আট-দশ দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

—কেস জেনুইন?

—নিশ্চয়ই স্যার। আমি যেমন জেনুইন, সেই রকম। আপনি আমাকে তো বিশ্বাস করেন।

বটব্যালের চোখ সার্চলাইটের মতন তারকের মুখের ওপর পড়ে। মুখ দেখেই মানুষ বুঝতে পারেন এমন অহংকার তাঁর আছে। আছে বলেই এ-ব্যবসা তিনি চালাতে পারছেন।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, ঠিক আছে তবে। আমি আরো এক সপ্তাহ ওয়েট করবো। নো মোর—

—আমি কথা দিচ্ছি স্যার, আপনি পেয়ে যাবেন। আগামী সপ্তাহেই পাবেন।

—দেখা যাক। এখন অন্য আর কিছু চাই না।

এবার তারকের উঠে পড়ার কথা। বিনা-প্রয়োজনে সময় নষ্ট করা বট-ব্যালের স্বভাব নয়। কিন্তু তারক উঠলো না। বটব্যালের ভুরু জিজ্ঞাসায় কুঁচকে ওঠার আগেই, জিভ কামড়ে তিনবার ঢোঁক গিলে তারক বললো
—স্যার—

—ইয়েস্—

—ইয়ে—মানে শ' পাঁচেক টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে।

—সে কী তারকবাবু!

—কেসটা খুব—খুউবই ডিফিকাল্ট স্যার, অনেক খরচা আছে। নইলে আমি কখনো অ্যাডভান্স চাইনি।

—চাওনি সেটা ঠিক। কিন্তু আমার পলিসি জানো—মাল দাও, টাকা

নাও।

—সেতো বটেই স্যার। কিন্তু কেসটা এত কঠিন—প্রায় অসম্ভব জিনিষ—

—কী কঠিন-কঠিন করছ তখন থেকে! অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গলা চড়ে বটব্যালের, ইটস নাথিং বাট আ ফিটাস। থার্টি-টু উইকস—ফুল গ্রোন—বাট ফিটাস অল দ্য সেম!

তারকের আজ টাকা চাইই। নতুবা এভাবে কখনো বলতে পারতো না। মরীয়া হয়ে বলে—আট-মাসের ভ্রূণের চেয়ে জীবন্ত বাচ্চা পাওয়া অনেক সোজা, স্যার। এরজন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হচ্ছে। ডাক্তারকে দিতে হবে, পার্টিকে দিতে হবে, আরো নানারকম খরচা আছে। আপনি তো স্যার, ভ্রূণ পেয়েই খালাস, আমাকে যে কী ভাবে জোগাড় করতে হয়—নেহাৎ স্যার পেটের দায়ে। নয়তো বামুনের ছেলে হয়ে—

—থামো, টারকবাবু, থামো। টাকা নিয়ে যাও তুমি। কিন্তু কোনো ট্রিকস খেলার চেষ্টা করো না। শুক্রবারের মধ্যে আমার মাল চাই।

—পাবেন স্যার, শুক্রবারের মধ্যেই পাবেন।

—গুড। শোনো টারকবাবু, ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। থার্টি-টু মীনস থার্টি-টু। কম বেশি হলে এক পয়সাও পাবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গলা মুখ আরেকবার মুছে নিলো তারক, ঘেমে গিয়েছিল তো! ঐ হায়নার সামনে বেশিক্ষণ বসাই মুশকিল। গলা বুক থেকে শুরু করে গ্রেটার-ইনটেসটাইন পর্যন্ত সব শুকিয়ে যায়।

পাঁচ বছর ধরে লোকটার সঙ্গে কারবার। অথচ আজো পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ হতে পারলো না। সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় যেন চিবিয়ে আস্ত খেয়ে ফেলবে। একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, টাকা পেলেও কৌতূহল মরে না—স্যার, এই নানা বয়েসের ভ্রূণ নিয়ে আপনি কী করেন?

অনেকদিন ধরেই ভাবছিলো তারক। কখনো চার মাস, কখনো পাঁচ মাস—চোদ্দ থেকে কুড়ি সপ্তাহের ডিম্যাণ্ডই বেশি। এবারই হঠাৎ একেবারে আট মাস—থার্টি-টু উইকসের চেয়ে বসলো। এ জিনিশ কি চাইলেই পাওয়া যায়? আট মাস ধারণ করে খসাতে চাইবে কোন মাগী? তার চেয়ে একটা

গোটা বাচ্চা নিলে হয় না ?

তো বটব্যাল এমন গলায় জবাব দিলো, ওর মনে হলো শালা গলার মধ্যে যেন অ্যাটম বোম পুষে রেখেছে—কেউ মুর্গি কিনলে মুর্গিওলা কখনো মাথা ঘামায় নাকি সেটা খাবে না পুষবে, বা কারুকে দিয়ে দেবে কিনা। কত কীইতো মুর্গিটাকে নিয়ে করা যায়। সো ?

এরপরও তারক জানতে চাইবে সায়েব ভ্রূণ নিয়ে কী করেন, ওর বাপ তেমন কোনো আয়রন—ম্যান ছিল না। অবশ্য নানা সূত্রে শুনেছে, এসব ভ্রূণ ডাক্তারী গবেষণার জন্য এক্সপোর্ট হয়। ল্যাবরেটরী—মিউজিয়ামেও দরকার হয়। পৃথিবীতে কত অদ্ভুত ব্যাপার আছে। জ্যান্ত মানুষের কোনো দাম নেই, অথচ একটা চার মাসের ভ্রূণের জন্য দু'শো টাকা যে কোনো সময়ে পাওয়া যায়। মানুষের হাড়ও নাকি ভালো দামে বিকোয়—সে-লাইনটা তারক ধরেনি। একসঙ্গে বেশি ব্যাপারে জড়িয়ে সামাল দিতে পারবে, তেমন বেওসায়ী রক্ত ওর শরীরে নেই।

পাঁচটা চকচকে পাটভাঙ্গা নোট পাঞ্জাবীর ভেতরে গোপন পকেটে, গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে আছে। তারকের মনে হয়, গায়ের তাপ বেড়ে গেছে। এখনই খালাসীটোলায় গেলে হতো। কতদিন যায়নি !

ইচ্ছা দমন করে। সানি পার্ক থেকে হেঁটে গড়িয়াহাট। বাস ধরে ভবানীপুর। ডাঃ সামন্তকে আজই বলা দরকার।

ওকে দেখে রামচরিত বললো, রাম রাম চক্কোত্তিবাবু।

—রাম রাম। নতুন কেস কিছু এলো ?

—হঁহা! কুছ নহি। মার্কিট বহুত ডাল আছে।

রামচরিতের কথায় করুণ সত্য, ভ্রূণ না হেলদি বেবীর মতন বেরিয়ে আসে। কান্নাটা তারক ঠিকই শুনতে পায়। নতুন কেস-ফেস না-এলে তারক বা রামচরিতের চলে কী করে ? ডাঃ সামন্তের নার্সিংহোমের দারোয়ানি করেই কেবল রামচরিত মুলুকে দশ একর জমি, পাকা বাড়ি বানাতে পারেনি তো।

কিছুকাল আগেও এই নার্সিংহোমের দরজায় গাড়ি-ট্যাক্সির ভিড় লেগে থাকত। কত কেস ফেরৎ দিতে হতো। আর তখন বটব্যাল বললেই মাপ মতো ভ্রূণ তারক হাজির করে দিতো। তারপর গভর্ণমেন্ট যেই বললো, এমটিপি লিগ্যাল, অমনি গাড়িগুলো মুখ ঘুরিয়ে হাসপাতালে ছুটছে।

এমটিপি—মেডিকেল টারমিনেশন অব প্রেগনেন্সি। যত্তো সব! সোজা কথা বলনা বাপু, পেট-খসানো। ঘাঁটের নাম সুচরিতা!

অবশ্য কেস যে কিছু কম আসে তা নয়। বড়লোকেরা হাসপাতাল পছন্দ করে না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মান-ইজ্জত, সার্কাসের খেলায় দড়ির ওপর হাঁটার মতন, সারাক্ষণই গেল-গেল ভাব। সুতরাং কেস আসেই। আসবেও। মানুষ তো পশুর চাইতে উন্নততর জীব—সারা বছরই, তিনশ পঁয়ষট্টি দিনই মেটিং-ডে। ফলে ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক, তা বলে ভুল নিয়ে কেউ কি বসে থাকে?

তাছাড়া অন্য কতরকম কেসইতো আসে। যত মানুষ, তত অসুখ। নেহাৎ তারকের ভ্রূণমুখী মন, ওতেই যা কিছু আমদানী। আলসার-অর্শ-গল-ব্লাডার নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই।

—রামচরিত, ডাক্তারবাবু আছেন?

নার্সিংহোমের দেয়াল ঘেঁষে ডাঃ সামন্তর বটলগ্রীন গাড়িটা তারক ঠিকই দেখেছে। তবু, জিজ্ঞেস করলো, কাছাকাছি কোথাও যদি বেরিয়ে থাকেন। ডাক্তারদের জন্য ইমার্জেন্সি লেগেই থাকে।

বটব্যালের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ৩।৪ বছর আগে থেকেই ডাঃ সামন্তর এখানে কাজ করছে তারক। কাজ বলতে বাঁধাধরা কিছু না। ডাক্তারবাবু যখন যা বলেন—কখনো কোনো রোগীকে ইনজেকশন দেয়, ল্যাবরেটরীতে ব্লাড-স্টুল-ইউরিনের স্যাম্পেল দিয়ে আসে, রিপোর্ট আনে, গাড়ি খারাপ হলে মেকানিক ডাকে। কেস নিয়ে এলে কমিশন পায়। কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগের পঁচিশ বছরের চাকুরে তারকনাথ বাড়ি বাড়ি ঘুরে কম লোক চিনেছে! মানুষের বিপদে, অবাঞ্ছিত গর্ভের মতন বড়ো বিপদ ভদ্রমানুষের আর হয় না, তারকের নিঃস্বার্থ সাহায্য ডাক্তারবাবুর বরাভয়ের চেয়ে এতটুকুও কম স্বস্তি ও নিশ্চিন্তির নয়। এবং তারক যা করে স্বার্থহীনভাবে করে। পার্টির কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয় না। পরোপকারের মধ্যে কুঁচকি-চুলকানোর মতন তুষ্টিপ্রদ একটা মহৎ-মহৎ ভাব থাকে।

ভ্রূণ সাপ্লাইয়ের লাইনটা ধরার পর তারকের বরং অনেকবারই মনে হয়েছে, পার্টিদের খালাসের ব্যাপারটা ফ্রি করে দিতে পারলেই ভালো। ওরা যা খসানোর জন্য ডাক্তারকে টাকা দেয় তারক সেই মালই সাপ্লাই করে বটব্যালের কাছ থেকে টাকা গুণে আনে। শালার দুনিয়া, মাইরি, আজব।

প্রথম দিকে কাজটা, ভ্রূণ-পাচার, ডাক্তারবাবুকে লুকিয়েই করত। নার্স জমাদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। ভেবেছিল এভাবেই চালিয়ে যাবে। তখনো বটব্যালকে সম্যক বোঝেনি।

একদিন বটব্যাল বললেন, আড়াই মাসের ভ্রূণ চাই। দিলেই তিনশ টাকা। সন্ধ্যেবেলাতেই সেদিন কেস ভর্তি হলো। স্টেন উইকস। খুশিতে তারক অলিম্পিক রানারের মতন দৌড়বে ভাবছিলো। কিন্তু হেড নার্স এসে বললো, কেসটা কিউরেট করা হবে। তার মানে ভ্রূণ পাওয়ার কোনো আশা নেই। অথচ ওটা চাই-ই। বটব্যালকে কথা দিয়ে এসেছে। টাকাটারও ভীষণই দরকার।

অগত্যা ডাক্তারবাবুকে বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ততদিনে তারক মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছে যে, ডাক্তারবাবুকে বিশ্বস্ত সেবায় সেই টিকা ও দিতে পেরেছে যাতে তাঁর মনে ওর জন্য স্নেহ ও করুণা কোনোরকম ক্রোধকে সক্রিয় হতে দেবে না।

ডাঃ সামন্ত ওর আবেদন শুনে বললেন, ওটা নিয়ে তুমি কী করবে?

তারক বাঁ-হাতের তালুতে নস্যি-টেপা ডান হাত আড়াল করে বললো, স্যার, একটা পার্টি ওটার জন্য কিছু টাকা দেবে বলছিল। আপনি তো আমার অবস্থা জানেনই—

ডাক্তারবাবুর আপত্তি করার কিছু ছিল না। টাকা যা পাওয়ার তা তিনি পাবেনই। কারুর ক্ষতি না করে যদি অন্য কারুর উপকার হয় তো ভালো কথা।

বললেন, ঠিক আছে, তারকনাথ। ঐ ফিটাস তুমি পাবে। আমি হিস্টেরটমি করে দেবো। তবে একটু সামলে-সুমলে। আমাকে যেন বিপদে ফেলো না।

তখনো এমটিপি লিগ্যাল হয়নি।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে তারক দেখলো ডাক্তারবাবু ঘরে একা। কাগজপত্র দেখছেন। এই-ই সময়। এখনই কথাটা বলে ফেলা দরকার। তারক রুমালে দুহাত ভালো করে মুছে নেয়। হঠাৎ ধক্ করে ওঠে বুক— ডাক্তারবাবু যদি রাজী না-হন। পলকের জন্য চোখের পাতায় দুলক কালো

পিঁপড়ের উপস্থিতি টের পায়। পলকের জন্যই কেবল। কোনো কল্পিত ভয়ে কুঁকড়ে যাবে তারক সে-রকম মানুষই নয়। নিরুপায় হলে শেষ অস্ত্র হিসেবে গলায় করুণ হাহাকার বাঁশের বেহালার মতন বাজাতে একটুও দেরি করবে না। ডাক্তারবাবু এসবে এখনো ভড়কি খেয়ে যান।

তারকের কৃশ ছায়া টেবিলে পড়তেই ডাঃ সামন্ত মুখ তুললেন, কী খবর তারকনাথ?

—একটা কেস ছিল, স্যার।

—কী কেস?

—খস্—মানে—এমটিপি, স্যার।

—ও! কত ওল্ড?

—একটু বেশিই স্যার। থার্টি-টু উইকস।

—কী বললে! ডাঃ সামন্ত চেঁচিয়ে ওঠেন—থার্টি-টু উইকস—সে তো ফুল গ্রোন! না তারকনাথ, এটা আমি পারবো না।

বুক কাঁপে তারকের। ম্যারাথনের শেষ পাকে এসে পা পিছলোবে? সমূলে মারা পড়বে যে। গলার ভাঁজে তৈলাক্ত মসৃণতা এনে বললো, এ-কেসটা আপনাকে করে দিতেই হবে, স্যার।

—তার মানে?

—এ আমার নিজের কেস—কোনো রিস্ক নেই।

—নিজের মানে—তোমার স্ত্রী?

—না, মানে স্ত্রী নয়। তবে একরকম তাই আরকি!

ডাঃ সামন্ত কিছু বুঝতে না-পেরে বিহ্বল বোধ করেন। স্ত্রী নয়, অথচ একরকম তাই-ই, এর একটা অর্থই হয়। তারকনাথও—? মহা-পাখোয়াজ লোক বটে! মনে-মনে হাসেন তিনি, কোনো মানুষকে দেখেই কিছু বোঝার উপায় নেই। কিন্তু তারকনাথও—আশ্চর্য।

তারক বললো, এই দেখুন স্যার, আমি সব রিপোর্ট নিয়ে এসেছি। ব্লাডপ্রেসার ওয়েট সব নর্মাল। কোথাও কোনো গোলমাল নেই। তবু কিছু হলে আমি তো আছিই।

ডাক্তারবাবু বললেন, বয়েস কত?

—মেয়েদের বয়েস—তা সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ—

—এটা কত নম্বর?

—ছয়, না, সাত নম্বর, স্যার। সেজন্যই মানে—ভয়ের কিছু নেই।

—ভয়ের কথা হচ্ছে না। তুমি এত দেরি করলে কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

নিরীহ, লাজুক, অপরাধী-অপরাধী মুখ করলো তারক। গলার স্বরের মসৃণতাতেই কাজ হয়েছে। এবারে আরো মিহিস্বরে বললো, আমাকে আগে বলেনি, এখানে ছিলও না। তারপর স্যার, টাকাপয়সার ব্যবস্থা—খরচা-পাতি তো কম না—

—টাকা পয়সা? আমি তোমার কাছে টাকা নিতাম তারকনাথ?

—ছি ছি ছি। সে-কথা বলিনি স্যার। আপনাকে দেবো সে টাকা আমার কোথায়। তেমন আস্পর্দ্ধাও হবে না আমার। তবু স্যার খরচা তো একটা আছে। আমি তো জানি—অষুধপত্র, নার্স, এনেসথেসিয়া—হুজ্জোত কি কম!

এই সব বুকনি বিশ্বাস করবেন ডাঃ সামন্ত তেমন নির্বোধ নন। তিনি তীক্ষ্ম প্যাথলজিক্যাল চোখে তারকের মুখ দেখেন। সেই কবেকার হিস্টেরটমির কেসটার কথা মনে পড়ে। সে কী একটা? তারপরও কতবার করেছেন। নার্স-সুইপারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তারকনাথ কত পয়সা বানিয়েছে সঠিক ধারণা করতে পারেন না বটে, তবু একটা অনুমান তো আছেই।

প্রখর স্বরে বললেন, সত্যি করে বলোতো, তারকনাথ, তোমার মতলবটা কী?

ডাক্তারবাবুর গলার স্বরে সাইরেন শুনতে পেলো তারক। হঠাৎই কণ্ঠ শুকনো লাগে।—স্যার!

—তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কী?

নির্ভুল সাইরেন! আর উপায় নেই। তারক টের পায় পাঞ্জাবী ভিজে উঠেছে। সাদা-কালো লোমের গোড়ায় শিরশিরে ঘাম। ও বোঝে আর দেরি করা বৃথা। ও একই সঙ্গে গলা আরো তৈলাক্ত, আরো মিহি করে, বাঁশের বেহালায় ধীর ছড় টানে। ভাঙা গালে, শুকনো ঠোঁটে গলিত তরল হাসির স্পিরিট ছড়িয়ে বলে,

—আপনার কাছে কিছুইতো লুকোছাবি নেই, স্যার। সবই জানেন। পাঁচটা ছেলেমেয়ের একটাও মানুষ হলো না। বড়ো মেয়েটাকে নিয়ে কী যন্ত্রণায় পড়েছি, কী বলবো আর! বিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

তাই স্যার, পার্টি যখন বললো থার্টি-টু উইকসের জন্য অনেকগুলো টাকা দেবে, তখন ভাবলাম, একমাসে আর কী আসে যায়। নইলে মিথ্যে বলবো না স্যার, মালতী আমাকে মাসখানেক আগেই বলেছিল। আপনি দেবতা—আপনার ভরসাতেই—এবারটা কোনোমতে বাঁচিয়ে দিন স্যার! বাপ হয়ে নিজের মেয়ের নির্ঘিন্ন কথা আর কি বলবো—ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ডোম-চাঁড়ালের কাজ করছি—

শেষের তিন লাইনে বেহালা এমন কঁকিয়ে বাজালো, তারক নিশ্চিত যে ডাক্তারবাবুর মনের রাগ বা দ্বিধার ট্রেমব্রাইও-ও নিখুঁতভাবে কিউরেটেড হয়ে গেছে। একেবারে ক্লীয়ার লাইক হুইসল। কথাটা ডাক্তারবাবুকেই বলতে শুনেছিল।

—তুমি কি মানুষ, তারকনাথ।

বলতে গিয়েও বললেন না ডাঃ সামন্ত। মানুষের ডেফিনিশন সম্পর্কে তিনি আজকাল আর একেবারেই নিশ্চিত নন। এতরকম আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য কেস দেখেছেন, দেখছেন যে তিনি আর প্রচলিত রীতিতে মানুষকে বোঝার ও বিচার করার চেষ্টা করেন না।

—এবারটা উদ্ধার করে দিন, স্যার। তারক গলায় গভীর মীড়ের কাজ তোলে। অনুনয়ে গলে যায়।

পুরো এক মিনিট ভাবলেন ডাঃ সামন্ত। চিত্ত অনেকটাই দ্রব। তারকের অবস্থা তিনি জানেন। এক ধরণের মমতাও জমে গেছে মনে। প্রায় শ' চারেক এমটিপি করছেন বছরে, না হয় আরো একটা করবেন। তারকের সঙ্গে আরো কথা বলা মানে অযথা সময় নষ্ট।

বললেন, ওয়েল, তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে। কিন্তু তারকনাথ অনেক দেরি করে ফেলেছ। এখন এমটিপি করা খুব রিস্কি।

লাফ দিতে গিয়েও থেমে গেল তারক। বুকের মধ্যে আশ্বস্ত খুশির থৈথৈ উচ্ছলতার ওপর করুণ-করুণ আঁকিবুকি বজায় রেখে বললো, বলেছি তো, স্যার, আমার নিজের কেস। রিস্কের জন্য ভাববেন না। আমি তো আছি—থাকবো। আমি তো আপনাকে বিপদে ফেলবো না, স্যার!

—তবে আর কথা কী। কবে করাতে চাও?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে তারক হিসেব করে, আজ শনিবার, বটব্যালকে যদি কথামতো মাল দিতে হয় তবে বিষ্যুৎ-শুক্রবারের মধ্যেই ব্যাপারটা সেরে

ফেলতে হবে। শুক্রবার বলতে গিয়েও ভাবলো, হাতে একটা দিন থাকা ভালো।

বললো, বুধ-বিষ্যুৎ যেদিন বলবেন।

ডাক্তারবাবু তাঁর ডায়েরি দেখে বললেন, বুধবারে পারবো না। বিষ্যুৎবারেই হবে। পেশেন্টকে বুধবার রাতেই আনতে হবে। সেসব তো তুমি জানোই। কিন্তু মনে রেখো, আমি আবারো বলছি, এটা খুব রিস্কি কাজ। তুমি বরং আরেকবার ভেবে দেখো।

আবার ভাবাভাবি। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে তারক সোজা খালাসিটোলায় চলে এলো। একটা পাঁইট নিয়ে ঘনঘন চুমুক দেবার পরই কেবল মগজের মধ্যে ছুটন্ত ঘোড়াটা কিছু শান্ত হয়। আরেক চুমুক মুখের মধ্যে কুলকুচি করার মতন নাড়তে নাড়তে নিজের মনে কুলকুল হাসে। ফেরেববাজিতে নোবল প্রাইজ দেবার নিয়ম নেই, মাইরি! কেমন টুপি পরানো হলো দুজনকে। কিচ্ছু খরচ নেই, ডাক্তারবাবু টাকা নেবে না ও জানতই। তবু স্রেফ কৌশলে পাঁচটা পাটভাঙা নোট পকেটে জমা। শালা, ডাক্তারবাবু নির্ঘাৎ ভেবেছে ও অন্য কোনো মেয়েমানুষের পেট করে দিয়েছে। সত্যি কথা জানলে ব্যাটা হয়তো রাজীই হতো না। তবে হ্যাঁ, মেয়ের কথাটা ঠিক বলেছে। ঐ খানকি, নিজের মেয়ে তো কী হয়েছে, এতদিন যে পেটটা বাঁচিয়ে রেখেছে তাই-ই ঢের। আজকাল কোন একটা ছোকরার সঙ্গে খুব নাকি আশনাই চলছে—ওর মা বলেছে। বটব্যালের কাছ থেকে টাকাটা খিঁচে নিয়েই ওকে বিদেয় করবে। দিনদিন যা সব কেচ্ছা দেখছে। কম কেস নিয়ে গেছে নাকি ডাক্তারের কাছে। শালা যত পেট খসিয়েছে তা দিয়ে আরেকটা কলকাতা শহর ভরিয়ে ফেলা যেত।

কিন্তু তারক নেমকহারামি, না, ভ্রূণহারামি বলাই ঠিক, করবে না। কেচ্ছাগুলো হয়েছে বলেই না ও ভ্রূণগুলো পেয়েছে। বটব্যাল একটা চামার। একশ দুশর বেশি দিতেই চায় না। অর্ডার-মাফিক মালগুলো যেন ফেকটরিতে তৈরি হয়! তবু যা হোক ঐ দিয়েই বেঁচে গেছে। সাতটা প্রাণীর খাঁই কিছু কম না। তাও তো বাপের আমলের বাইশ টাকা ভাড়ার ঘর দুটো ছিল। নইলে এতগুলো মানুষের শোবার জায়গা করতেই পাছার কাপড় খুলে পড়ত।

ঘরের কথা মনে হতেই তারকের মেয়ের প্রতি মনটা নরম হয়। বেচারীর

আর দোষ কী! চোখের সামনে বস্তির মধ্যে যা দেখছে, এই উঠতি বয়সের কুটকুটানি না হয়ে পারে না। শুধু বস্তির মধ্যেই বা কেন, নিজের ভাই-বোনের জন্ম-বেত্তান্তও যে দেখেনি তাইবা কে বলবে! বউকে নিয়ে শোবার জন্য ওতো আলাদা কোনো ঘর পায়নি।

বউটাও তেমনি। বোকা-বোকা, গুবো-গুবো হলে কী হয়, পেটের মধ্যে যেন ইঁদুর-মারা কল বসিয়ে রেখেছে। ছুঁলেই আর রক্ষা নেই। তারক সাবধানী চালাক চতুর মানুষ। সেজন্য মাগীর বিয়োনোটা ছ'য়েই আটকে রেখেছিলো। শেষ বাচ্চাটা টেঁসে যাওয়ার পর ক'বছর ইঁদুর কলের যন্ত্র-পাতি খারাপ হয়েছিলো বোধহয়। নিশ্চিন্ত মনে বেহিসেবী হতে গিয়েই ফের ফেঁসে গেল।

তখন দিনরাত বটব্যালের উস্কানি। তিন হাজার টাকার টোপ। তারকের মাথার মধ্যে ইন্‌ট্রা-ক্রেনিয়াল ইনজেকশন ফুঁড়তে থাকে। সারা কলকাতা তোলপাড় করে কেস ধরার জন্য। বৃথা। হারামী বটব্যাল খালি-খালি ডাক পাঠায়—কী হলো, তারকবাবু, তিন হাজার দেবো বলেছি, আর তুমি একটা ফিটাস জোগাড় করতে পারছ না।

বত্তিরিশ সপ্তাহের ভ্রূণ যেনবা বেবীফুড বা কেরোসিন। বাজারে নেই, কিন্তু লাইন ধরতে পারলেই পাওয়া যাবে! চেষ্টা কিছু কম করেছে নাকি? চব্বিশ-পঁচিশ সপ্তাহের কেস পেলেই গিয়ে বলেছে, আরো কয়েক হপ্তা ধরে রাখো, একেবারে ফিরি করিয়ে দেবো। তখন তারক তিন হাজার থেকে এক হাজার পর্যন্ত খরচ করতে রাজী ছিলো। হলে কী হবে! অতদিন কেউ অপেক্ষা করতে চায় না। সবাই ভয়ে শামুক সাজে—বেশি দেরি হয়ে যাবে, জানাজানি হয়ে যাবে। ব্যাপারটা যেন বিপ্লব করার মতন। গোপন ও দ্রুত না হলেই বিপদ। এই সব সময়ে লোকে টাকার প্রলোভনও তাচ্ছিল্য করে। উল্টে ওকেই বলে, আপনাকেও কিছু দেবো, জলদি খালাসের ব্যবস্থা করে দিন।

তিতবিরক্ত তারক ভেবেছিলো বলবে, এ-মাল পাওয়া যাবে না। ও অন্তত সাপ্লাই করতে পারবে না। বটব্যাল অন্য চেষ্টা করুক। বলি-বলি করেও বলেনি। তিন হাজার অনেকগুলো টাকা। মেয়ের বিয়েটা ভীষণ জরুরী। ওটাকে পার না করতে পারলে কোনদিন কী করে বসবে কে জানে!

এই রকম যখন মাথার-ঘায়ে-কুকুর-পাগল অবস্থা তারকের তখনই একদিন মালতী বললো, বুড়ো বয়সে তুমি কী করলে বলোতো!

কেঁদে-কঁকিয়ে গালাগালির তুফান ছুটিয়ে সে এক ভয়ানক অবস্থা। যেন তারক একাই দায়ী। মেয়েমানুষের ঐ এক ঢং। খাওয়ার সময় সব চেটে-পুটে খাবে, তারপর গণ্ডগোল হলেই যত দোষ মুখপোড়া মিনসের। তিন নম্বর সন্তান থেকেই এরকম চলছে।

—দুদিন বাদে মেয়ের বে হবে। এখন এসব—কী নজ্জা! ধাড়ি ছেলে-মেয়ের সমুখে ধুমসো পেট নিয়ে ঘুরতে পারবো না। তুমি যাহোক ব্যবস্থা করো।

মালতীর গর্ভবতী হওয়ার চাইতেও ওর মুখে ব্যবস্থার কথা শুনে তারক চমকে ওঠে বেশি। পরপর দু'মেয়ের পর ছেলে হতেই তারক আর ছেলেপুলে চায়নি। চতুর্থ সন্তানের সময় ব্যবস্থার কথা বলেছিল। মালতী তখন নাহক কী-না বলেছে! ব্রাহ্মণীর পাপপুণ্য জ্ঞান তখন বিষফোঁড়ার মতন টনটনে ছিল। এবারে মালতী নিজে থেকেই বলছে। বাঃ! ওকে আর অহেতুক মুখ-ঝামটা খেতে হবে না।

তারক বললো, কদ্দিন হয়েছে?

লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে মালতী বলে, তিন মাস চলছে।—ঐ ভঙ্গি দেখে তারকের মনে হয়, এই বয়েসেও অমন ভঙ্গি আসে—মেয়েরা এক তাজ্জব সৃষ্টি বটে!

—তিন মাস! এদ্দিন বলোনি কেন?

—বুঝবো তবে তো!—ঝাঁঝিয়ে ওঠে মালতী—আগেও দু'একবার গোলমাল হয়েছিল।

—এখন বুঝলে কী করে?

মুখে আঁচল টিপে হাসি চাপতে-চাপতে মালতী বলে, তুমি আর হাসিও না। ছ' বিয়োনী মাগীকে উনি গবভো চেনাচ্ছেন!

কথায় অসঙ্গতি না-থাকলে আর মেয়েমানুষ! তারক অনর্থক তর্ক করেনি। সামন্ত ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করবে বললো।

পরদিনই বটব্যালের অমোঘ ডাক। এবং রীতিমতো দাবড়ানি।

—তাহলে টারকবাবু, তোমার সঙ্গে আমার কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে হবে। একটা মাল তুমি দিতে পারছ না—কবে পারবে তাও বলতে পারছ

না। এভাবে তো বিজনেস চলে না।

কাজকর্ম বন্ধ করে দিলে তারকের চলবে কী করে! সাতটা হাঁ-করা মুখ, মেয়ের বিয়ে, তার ওপর মালতী আবার একটা বাঁধিয়ে বসেছে। ঝাপসা চোখে তারক সেদিনই বটব্যালের বদলে হায়নার মুখ দেখে প্রথম।

তখনো ঝুলঝাঁপ্পি খেলার কথা মনে পড়েনি ওর। কাতর স্বরে বলেছিল, আরো কিছুদিন সময় লাগবে স্যার। ফল ধরলেই তো হয় না, পাকার সময় দিতে হবে।

—সময় দেবো না বলিনি তো। কিন্তু ফল ধরেছে কিনা সে-খবরটা তো দেবে।

—দেবো স্যার, দু'চারদিনের মধ্যেই দেবো।

হারাধন মুনসির কেসটা ছিল হাতে। পাঁচ মাস। ভজিয়ে-ভাজিয়ে ওটাকেই আট মাস পর্যন্ত টেনে নেবে ভেবেছিল। কিন্তু সেদিনই খবর নিতে গিয়ে শুনলো আগেরদিন কলতলায় পড়ে কেস লিক্যুইড হয়ে গেছে। হারাধন বউকে নিয়ে হাসপাতালে।

মনের দুঃখে, যন্ত্রণায়, উদ্বেগে দিশাহারা তারক খালাসিটোলায় একটা পুরো পাইটই গিলে ফেললো। মাল খেলেই মাথাটা যা সাফ থাকে! বুদ্ধি খোলে। মাথা তোলপাড় করে নানারকম বুদ্ধির সুতো ধরে টানাটানি করে ও।

হঠাৎ ঘাড়ের ওপর রদ্দা—কী বে, এখনো ঝুলঝাঁপ্পি চালিয়ে যাচ্ছিস!

ঘাড় ঘোরাতে হয়নি। রদ্দার হাঁটু-কাঁপানো আদর, গলার স্বরে গমকলের শব্দ আর ঝুলঝাঁপ্পি এই তিনে মিলে যদি বলাইচন্দর না হয় তবে অহিংসা সত্যাগ্রহ আর অনশনের সঙ্গে গান্ধীজীর কোনো সংস্রব ছিলো না।

—বলাই, তুই! পুরোনো সাঙাতের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দে তারক খাবি খায়। দুটো পাঁইটের অর্ডার দিতে এক মিনিটও দেরি করে না।

ছেলেবেলায় বহরমপুরে মামার বাড়িতে যখন যেত তখন থেকেই বলাইয়ের সঙ্গে দোস্তি। ওর কাছেই ঝুলঝাঁপ্পি খেলা শেখা। বিরাট বিরাট আম গাছের ওপরে উঠে এ-ডাল ও-ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ঝুপুস শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো। নিচে পুকুর থাকলে জলে নইলে মাটিতেই। হাড়গুলো যে জায়গামতো থেকে গেছে, অত ঝুলঝাঁপ্পির পরও, সে কেবল হনুমানের বংশধর বলেই। মানুষের হাড় অত শক্ত হয় না।

অনেক বছর পর দেখা হলে বলাই জিজ্ঞেস করেছিল, তারক কী করছে। এক গাল হেসে ও বলেছিল, কী আবার, ঝুলঝাঁপ্পি!

বলাই প্রথমে বুঝতে পারেনি। তারক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়, সেই একই ব্যাপার। এ-ডাল ও-ডাল ধরে ঝুলছি আর লাফাচ্ছি। বেঁচে থাকার ডন-বৈঠক আর কী!

অনেকদিনের কথা। তারক ভুলে গিয়েছিল। জীবন ভোলেনি। সারাদিন আসলেই যা করে, এক জায়গায় ঝুল দেয়, আরেক জায়গায় ঝাঁপ্পি লাগায়—ফেরেববাজের জীবন এছাড়া অন্য কিছু কি?

নেশায় পায়ে, একটু বেশি রাতে ঘরে ফেরার সময় ঐ চিন্তাগুলো পেয়ে বসে। তখনই, ঐ ঘোরের অবস্থাতেই, সিদ্ধান্তটা পাকা করে ফেলে। খেলছি যখন, শালা, নিয়ম-মাফিকই খেলবো।

পরদিনই মালতীকে ডাক্তারের কাছে হাজির করলো। সামন্ত ডাক্তার না। দীর্ঘচেনা অন্য ডাক্তার। আগেই বলে রেখেছিলো যেন মালতীকে আসল কথা কিছু না-বলে। এটুকু ম্যানেজ করতে না-পারলে তারক আর করলো কী!

ডাক্তার বললো মালতী ঠিকই তিন মাসের গর্ভবতী। ও বউকে বললো, হুঁ হুঁ! আমি ঠিক ধরেছিলাম, এ হতেই পারে না। আমি বলে কত সাবধানে সব সারি। হলেই ভাবতাম বুড়ো বয়েসে কোথায় কি ঢলাঢলি করেছ!

বউ মানে না—কী যা তা বলছ! তাহলে এই যে তিনমাস ধরে—আমি কচি খুকী নাকি!

আরও একটু রসিকতা করে তারক বোঝায়—আসলে এর টিউমার হয়েছে। টিউমার হলে গর্ভের সব লক্ষণই দেখা দেয়।

—ও মা! সেতো সাংঘাতিক রোগ গো।

ঐটুকু চিৎকারে তারক ঘাবড়ায় না। বলে—কিচ্ছু সাংঘাতিক না। ক'দিন পর—ম্যাচিওর হলেই অপারেশন করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এত সহজে এ-ব্যাপার মেটে না। খিঁচিখিঁচি লেগে থাকে। প্রতিবেশীদের মধ্যে রটে যেতে, মুখরোচক খবর রটতে দেরি হয় না, সবাই নানারকম মতামত জানাতে লাগলো। যার মধ্যে ভয়ের মিশেল অনেকখানি। পেটে

টিউমার—ক্যান্সারের আগাম দূত। এর জানা তার চেনা অনেকের হয়েছে, কেউ মরেছে। কারুর জরায়ু বাদ দিতে হয়েছে। রোগের বিষয়ে জ্ঞান দিতে ডাক্তার হওয়ার দরকার হয় না।

ছ'মাস পেরুতেই মালতী বলে, তুমি বলছ টিউমার। আর আমি পষ্ট পেটের মধ্যে নড়াচড়া টের পাচ্ছি।

তারক বললো, ও তোমার মনের ভুল। টিউমারও একটু-আধটু নড়াচড়া করে।

বললো বটে, তবু আরো কয়েক বার ডাক্তার ম্যানেজ করতে হলো। মেয়েমানুষ তো নয়, একেবারে ভীমরুলের চাক। রাতদিন গোঁ গোঁ।

পাঁইটের শেষ ফোঁটা গলায় ঢেলে উঠে পড়লো তারক। আর মাত্র কটা দিন। আজ গিয়েই ঘোষণা করে দেবে—বুধবারে ভর্তি, বিষ্যুৎবারে অপারেশন। তারপরেই—না, তার আগে অবশ্য বটব্যালের কাছ থেকে পুরো টাকা গুণে নিতে হবে। টাকাটা হাতে পেলেই—ঝপাস!

কলকাতায় তেমন গাছ নেই। থাকলে উচ্চিংড়ে ছেলেগুলোকে তারক নিশ্চয় ঝুলঝাঁপ্পি শিখিয়ে দিত।

বিষ্যুৎবার সকাল নটার আগেই তারক নার্সিংহোমে হাজির। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় মালতীকে জমা দিয়ে গেছে। হেড নার্স থেকে সকলেই জানে ওর নিজের কেস। সেজন্য মালতী প্রায় ভি আই পি পেশেন্টের মর্যাদা পাচ্ছে।

রামচরিত্তের কাছে ফর্টি পার্সেন্ট ফর্মালিন সল্যুশন ভরা কাচের জার রেখে এসেছে। ফিটাস বেরুলেই ওতে ভরে বটব্যালের কাছে চালান করবে।

গতকালও ডাক্তারবাবু বলেছেন, খুব রিস্কি তারকনাথ। শুধু তোমার জন্য, নইলে এই কেস আমি কিছুতেই করতাম না।

তারক ভীতু না মোটেই। কত উঁচু ডাল থেকে লাফ দিতেও কখনো বুক কাঁপেনি, অতিরিক্ত শ্বাস ফেলেনি একটা। অথচ, এখন বুকের মধ্যে থেকে থেকে একটা, ভয় বলবে না—উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা—জেগে উঠছে: মালতীর কিছু হবে নাতো? মালতী যদি আসল কথাটা জেনে ফেলে? জানলেও তারকের শঙ্কিত হওয়ার কিছু থাকবে না। একটু বা চেঁচামেচি করবে, গালাগাল দেবে।

ও ঠিক বুঝিয়ে দেবে, মালতীই তো 'ব্যবস্থা'র কথা বলেছিল। এইটুকু ঝুল না-দিতে পারলে সারাজীবনে তারক কী আর খেলা শিখলো!

কিন্তু, যদি, মালতীর কিছু হয়!

শুকনো মুখ দেখে রামচরিত তিনবার বলে গেছে, ঘাবড়ায়ে মৎ চক্কোত্তি-বাবু। রামজীকো নাম লিন। সব ঠিক হইয়ে যাবে। লেকিন হামকো ভুলিয়ে যাবেন না।

শালা, বুড়ো শকুন। নিজের শেয়ারের জন্য হাঁকুপাকু করছে।

তারক ঘড়ি দেখলো—এগারোটা দশ। ইন্ট্রাইউটেরাইন হাইপারটনিক স্যালাইন গত রাতেই দেওয়া হয়েছিল। এতক্ষণে তো মিটে যাওয়া উচিত! ডাক্তারবাবু ও-টিতে ঢুকেছেন অনেকক্ষণ।

দু'দুবার নস্যি আঙুলে টিপেও টানতে ভুলে গেল তারক। খুব অস্থির বোধ করে। পাঞ্জাবীর নিচে লোমশ ত্বকে থকথকে জল। মুখ মুছে ও-টির দরজায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। কোনো শব্দ নেই।

ঘড়িতে এগারোটা চোদ্দ। ওটা বন্ধ নাকি?

বেশি উদ্বেগে ঘনঘন পেচ্ছাপ পায়। এরমধ্যেই তিনবার ঘুরে এসেছে। আর একবার যাবে নাকি? আরো একটু পায়চারি করে, কিছু পরে যাবে না হয়।

তারপরেই খুট শব্দ। ও-টির দরজা খুলে একটি নার্স বেরিয়ে আসে। মুখ দেখেই তারক বোঝে ভয়ের কিছু নেই।

নার্সটি যেতে-যেতে বললো, হেলদি মেল বেবী—এভরিথিং ওকে!

তারক প্রথমে কথাটা ধরতে পারেনি। সব ঠিক আছে অর্থাৎ মালতীর কিছু হয়নি—এই উদ্বেগ-মুক্তির শ্বাস মোচন করেই ও প্রথম কথাটা লুফে নেয়। বেবী? হেলদি? মেল? মানে? বেবী কে চেয়েছে? এম-টি-পিতে বেবী হয় নাকি? ডেলিভারীতে বেবী, এম-টি-পিতে ফিটাস। এ নার্সটা নতুন। এখনো কিছু শেখেনি।

যাকগে, মালতী ভালো আছে, সেটাই দারুণ স্বস্তির। ডাক্তারবাবু বেরুলেই হেড নার্সের কাছ থেকে ফিটাসটা নিয়ে সোজা সানিপার্ক। রামচরিতকে বললে হয় একটা ট্যাক্সি ডাকতে। থাক, একটু পরেই হবে।

ডাক্তার সামন্ত বেরিয়ে এলেন ও-টি থেকে। তারক তড়িৎ-পায়ে এগিয়ে গেল। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপে—আপনাকে কী বলবো স্যার,

আপনি যা করলেন—

—তারক!

ডাক শুনেই তারকের নাড়ী-ভুঁড়ি দলা পাকিয়ে যায়। উনি তো কখনো তারক বলে ডাকেন না। তবে কি—মালতী—তারক ভাবতে পারে না। কপালে ঘাম।

—তারক, ইটস আ লিভিং হেলদি মেল বেবী।

লিভিং? জ্যান্ত? জ্যান্ত ছেলে? ডাক্তারবাবু ঠিক বলছেন? নাকি ও ভুল শুনছে? এম-টি-পি করতে এসে জ্যান্ত ছেলে?

—স্যার!

—আমি তোমাকে বলেইছিলাম, এটা খুব রিস্কি। কখনো কখনো এমন হয়। আমার হাতে এই প্রথম। তুমি ভেতরে গিয়ে ছেলে দেখতে পারো।

ভুল নয়! ডাক্তার ভুল বলেননি। ও ভুল শোনেনি। ঠিক বুঝেছে, ও গিয়ে জ্যান্ত হেলদি ছেলে দেখতে পারে। ছেলে—জ্যান্ত ছেলে!

—স্যার, এতো আমি চাইনি। ও ছেলে নিয়ে আমি কী করবো?—তারক স্মরণকালে প্রথম আর্ত চিৎকারে ভেঙে পড়ে।

—জানি তারক, কিন্তু আমি তো জ্যান্ত ছেলেকে মারতে পারি না।

ডাক্তারবাবু কখন চলে গেছেন তারক জানে না। ওর চোখের ওপর কোটি কোটি কালো পিঁপড়ে। গলা-বুক শুকিয়ে খর।

ও কোনো ডাল দেখতে পাচ্ছে না। মাটি জল কিছুই চোখে পড়ছে না। আদিগন্ত অন্ধকার শূন্যতার ওপর ও একা দাঁড়িয়ে। কিন্তু খেলা তো শেষ হয়নি।

ঝাঁপ না দিলে খেলা শেষ হয় না।

মামুলি মানুষের সামান্য সময়

এপ্রিল, ১৯৭৬

আজ কত তারিখ? তিন-চার তারিখ হবে হয়তো। সাত-আট মাস ধরে এই ছোট্ট সেলে শুয়ে বসে দিনক্ষণের হিসেব রাখতে পারছি না। জেনেই বা লাভ কী হবে, আজ কত তারিখ! আমার তো কোনো প্রত্যাশা নেই, কোনো স্বপ্ন নেই!

তবু, কেবল মনে পড়ছে, এই এপ্রিলে ঢাকার রাস্তায় নিশ্চিত অজস্র কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। হঠাৎ হাওয়ায় নাচের উৎসব লাগছে স্তবকে স্তবকে। আকাশ মমতায় গভীরতা নিয়ে নীল। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল। পল্টন ময়দানে ঘাসেরা কি আবার ঘন সবুজ হয়েছে? এইসব এবার আর দেখা হলো না।

নয়া-পল্টনে আমার মেসের পাশের গাছটাকে কথা দিয়েছিলাম, এবারও তার উতরোল নৃত্যের উৎসব দেখবো। গেল না কথা রাখা। আমাকে ক্ষমা করো, হে কৃষ্ণচূড়াতরু!

এখনো মনে আছে গত মে মাসের পড়ন্ত বিকেলে তুমুল ঝড়ের দোলায় গাছভর্তি কৃষ্ণচূড়ার প্রলয় নৃত্য ·খ মনে হয়েছিল, ভ্যান গগের কোনো দুরন্ত ক্যানভাসের কথক নৃত্য দেখছি।

কিন্তু সেপ্টেম্বরে—তারিখটা ঠিক মনে আছে, ২৪শে,—যখন তারই পাশ দিয়ে বেকুব পায়ে পুলিশের গাড়িতে উঠলাম, তখন তাকে বড় ম্রিয়মাণ মনে হয়েছিল। ভাবতে ভালো লাগছে, এখন তার শাখায় শাখায় আবার অরুণ আগুনের পশরা।

এই ঘর থেকে জেল কম্পাউণ্ডের ভেতরে একটা গাছের ঈষৎ আভাস দেখতে পাই। জানি, বললে বাইরে বেরিয়ে গাছটার নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেও

দেবে হয়তো। আমার ইচ্ছে করে না। কিছু চাইতে, নিজের জন্য কিছু বলতে আমার বাধে। একটা অদৃশ্য হাত আমার ভোকাল কর্ড চেপে ধরে। কে? আমার বিবেক? অহংকার? উদ্ধত ইগো? ঠিক জানি না।

কিছুদিন আগে, এই জেলে আসার প্রায় মাস ছ'য়েক পরেই হবে, জামান সাহেব এসেছিলেন। জামান সাহেব বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৭৪-এর নভেম্বর পর্যন্ত আমি তাঁর কাগজে লিখেছি, বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। তিনি বললেন, মান্না, তুমি সেই একই রকম রয়ে গেলে। সময় বুঝে চলতে শিখলে না! এভাবে জেলে পচে কী লাভ হচ্ছে তোমার?

জেলে আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। কেউই কখনো আসে না। সুতরাং লাভ বা লোকসানের হিশেব কষার কোনো দায়ই আমার নেই। যদিও জামান সাহেবের কথা মেনে নিলে কিছু লাভ হতই। জেলমুক্তি—তাঁর কাগজের চাকরিতে ফিরে যাওয়া—এসবই হতো। কিন্তু তা আমার পক্ষে সম্ভব না।

সময় বুঝে চলা বলতে কী বোঝায় আমি আজো জানি না। সময়কে ঘন্টা-মিনিট দিন-বছরের হিসেবে মুদি দোকানের বাটখারার মতন আমরা ভাগ করে নিয়েছি। কিন্তু সময়ের কোনো বর্ণ নেই, গন্ধ নেই। আমি তবে কেমন করে বুঝে নেবো, কোনটা কেমন সময়! জামান সাহেবরা হয়তো পারেন। আমি বোধ হয় বর্ণান্ধ। আমার ঘ্রাণশক্তি খুবই দুর্বল। তাই সময়ের রকম আমি বুঝতে পারি না।

এবং একটা মানুষের জীবনে, আমার জীবনই ধরা যাক, কতটুকু সময়? ৫০-৬০ বছর। সময়ের অন্তহীন ম্যারাথন রেসের নিরিখে তা কতটুকু? তার সমস্তটাই কি কেবল সময়ের রূপ বুঝে নিতেই কাটিয়ে দেবো?

কেন?

আমি তো রাজনীতিক নই। কোনোদিন কোনো ময়দানে এক লাইনও বক্তৃতা দিইনি। একটাও রাজনৈতিক প্রবন্ধ বা বই লিখিনি। কোনোদিনও ভাবিনি মন্ত্রী, গভর্নর বা এ্যাম্বাসেডর হবো।

আমি ব্যবসায়ীও নই। কখনো পারমিট চাইনি। কালোবাজারি করিনি। পেল্লায় কোনো বাড়ি ফাঁদিনি। রোদ্দুর-পিছলানো গাড়িও করিনি। সারা জীবন মেসে-রিক্সায় কেটে গেল।

তাহলে কেন আমাকেও উত্তর খুঁজতে হবে সময় নামক প্রকাণ্ড ধাঁধার!

এবং একটা উত্তর নয়। সময় বারবার রং বদলাবে, আর প্রতিবার নতুন উত্তর জানতে হবে। এই ক্রমাগত—অন্তহীন—তৎপর মানসিক ব্যায়াম আমাকে আদৌ আকর্ষণ করে না। ভাবতেও ক্লান্ত বোধ করি।

জামান সাহেব বলেন, আমি না চাইলেও সময় আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না।

কয়নি। আগেও না। এবারেও না। কেবল এবার বড়ো প্রত্যক্ষভাবে বুঝলাম। কোনো প্রতিবাদ করিনি।

২৪শে সেপ্টেম্বরের সকালে আমার ঐ দীন মেসবাড়ি ঘেরা অন্তত দু'ডজন বন্দুক দেখেই বুঝেছিলাম, প্রতিবাদ নিরর্থক। আমি তাই জিজ্ঞাসাও করিনি আমার বিরুদ্ধে কী চার্জ। বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস—হয়তো। কখনোই যুক্তিশীল নয়। বন্দুকের কোনো মেধা বা বিচারবুদ্ধি নেই।

জেলার সাহেব মানুষটা সহৃদয়! আমার কিছু লেখাপত্র পড়েছেন বলে দাবি করেন। একদিন হঠাৎ বললেন, আপনাকে কেন ধরেছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, ইটস এ মিসটেক। আপনাকে শিগগিরই ছেড়ে দেবে। একটু সময় দিন।

সময়!! আমি দেবার কেউ নই। যার যেমন খুশি কেড়ে নিন। আমার কিছুই যায় আসে না। জেলে আটকে আছি বলে কোনো অভিযোগ করছি না। ছেড়ে দিলেও উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করবো না। জেলার সাহেব আবার একদিন বললেন, আপনাকে ছেড়েই দেবে। আপনার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ ফ্রেম করা যাচ্ছে না।

আমার হাসি পেয়েছিল। চার্জ ফ্রেম করা যাচ্ছে না বলে আমার কি দুঃখিত বোধ করা উচিত? আমি নিজেই কি চার্জ স্বীকার করে নেবো! প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল বলি, কেন, দেশদ্রোহী—ট্রেটর—বলে তো চালাতে পারেন। এটুকু সম্মানও কি আমি পেতে পারি না?

যেমন একাত্তর সালে পেয়েছিলাম। ইনি তখনো জেলার ছিলেন কিনা জানি না। কেন না সেবার, শেষ পর্যন্ত, জেলে আসা হয়নি। কিন্তু দেশ-দ্রোহী খেতাবটা ঠিকই পেয়েছিলাম।

এমনকি মিনুও প্রায় তাই বলেছিল। কেবল শব্দটা উচ্চারণ করেনি।

১৯৭১ এবং তারপর

'বুকস্ রুল দ্য ওয়ার্ল্ড।' কে বলেছিলেন? হ্যাঁ, মনে পড়ছে, ভলতেয়ার।

বা, আপনি ঠিক বলেননি, ভলতেয়ার। বই কিছুই শাসন করে না। হয় ঘরের কোণে অনাদৃত হয়ে গুমরে কাঁদে, আর নয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে রাস্তার আবর্জনা বাড়ায়। পৃথিবীর ইতিহাস কি তাই বলে না?

একাত্তরের সেটা মে কিংবা জুন মাস। যতদূর মনে পড়ে জুনই হবে। রাষ্ট্রবিরোধী প্রবন্ধ লেখায় খবরের কাগজ থেকে বহিষ্কৃত হলাম। কেন, কোন প্রবন্ধটা রাষ্ট্রবিরোধী আমাকে বলা হলো না। আজো জানি না। চাকরি হারিয়েও আমার হাসি পেয়েছিল। রাষ্ট্র বা রাজনীতি নিয়ে আমি কখনোই কিছু লিখিনি। ঐ ব্যাপারে আমার কৌতূহল খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। আমি চিরকাল মনে করে এসেছি, বিশ্বাস করেছি—এখনো করি—আমার একমাত্র আকর্ষণ মানুষ। কমিটমেন্ট যদি কিছু থাকে সে-কেবল মানুষের জন্য, মানুষের প্রতি। তাই নির্বিচার হত্যা মেনে নিতে পারি না, অহেতুক অকারণ গ্রেপ্তার আরণ্যক জবরদস্তি বলে মনে হয়। আমার প্রবন্ধেও এসব কথাই লিখেছিলাম।

চাকরি যাওয়াতে আমি না হলেও, বন্ধুরা খুব বিচলিত হলো। বললো—এবার তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। শুভানুধ্যায়ীরা বললো, আমার গা-ঢাকা দেওয়া উচিত। রাজি হইনি। কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি পালাবার। এখন মনে হয়, তখন হয়তো মনে কৌতূহল ছিল, দেখাই যাক না আমাকে ধরে কি না। ধরে কী করে!

ঠিক ঐ সময়েই একদিন ওদের বাড়িতে যেতেই মিনু বললো, সে কী! তুমি—তোমরা এখনো এভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

ওর আচমকা বহুবচন ব্যবহারের কারণটা আমি বুঝলাম। সরাসরি এ-কথাটা আমাকে বলতে আটকাচ্ছিল। ওর স্বরের আবেগমিশ্রিত স্নেহের উৎসটাও ধরতে পারলাম। বহমান দেশপ্রেমের উচ্ছল জোয়ারে স্পন্দিত হওয়াই—মৌখিক ভাবে—তখনকার লেটেস্ট ফ্যাশন।

আমি হাল্কা সুরে বললাম, আমার—আমাদের কী করা উচিত বলো তো?

সুকুমার রায়ের 'রামগরুড়ের ছানা' আবৃত্তি করার ঢংয়ে মিনু তখনকার চলতি কথাগুলো বলে গেল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত। আমাদের অর্থাৎ আমার—লড়াইয়ে সামিল হওয়া পবিত্র কর্তব্য—ফর্জ!

কিছুক্ষণ মিনুর মুখের দিকে নির্বাক তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, এই মেয়েটাই মিনু কিনা—অন্তত সেই মিনু যাকে আমি চিনতাম। ও যে দেশ,

স্বাধীনতা, মুক্তিসংগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে ভাবে, কথা বলতে পারে, মোটেই জানা ছিল না। পপ-মিউজিক আর লেডিজ ফ্যাশনের বাইরেও ওর আগ্রহ আছে ঐ মুহূর্তে সেটাই একটা আবিষ্কার।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হলো, মিনু এখন ইমোশ্যনালি এমন চার্জড্ হয়ে আছে যে আমার কোনো যুক্তি বা ব্যাখ্যাই ওর মাথায় ঢুকবে না। সেজন্যে বললাম, টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত গা-বাঁচাবার জন্য যেমন বলে, আমি একটা সাধারণ মামুলি মানুষ। আমি আর কী করতে পারি, মিনু!

ছোবল মারার মতন হিসহিস শব্দে, চোখ কুঁচকে, দুগালে ভাঁজ ফেলে, দু'সারি ঝকমকে দাঁতে বাতাস কুটিকুটি ক'রে মিনু অনিবার্য ভঙ্গিতে বললো য়ু—কাওয়ার্ড—ট্রে—

শব্দটা শেষ করেনি। তার আগেই ঢোঁক গিলে শব্দের বাকি অংশটা পাকস্থলিতে পাচার করে দিয়েছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম, আজো আছি, ও, মিনু, ট্রেটর শব্দটাই উচ্চারণ করতে চেয়েছিল। কেন করেনি, কোথায় বেধেছিল আমি জানি না। তবে, সেদিন পরে আমার মনে হয়েছিল, এখনো ভাবি, আসলে মিনু কোনো ইংরেজী সিনেমার নায়িকার আদলে ডায়ালগ দিচ্ছিল। কোন ছবি জানি না। কিন্তু মিনু জানতো নির্ভুল, নায়িকা (টেলর বা লোরেন) ঠিক ওভাবেই থেমে গিয়েছিল।

একেবারে পিত্তাশয় থেকে একটুকরো হাসি উঠে আসে আমার ঠোঁটে। তিক্ত বিস্বাদে মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে। সামান্য সময়। বুকের মধ্যে মোচড় লাগে। প্রিয় নারীর কাছে অহেতুক তিরস্কৃত হলে যে-কোনো পুরুষের যেমন লাগে।

হঠাৎ স্পেন্সার, হার্বার্ট স্পেন্সারের একটা লাইন মনে পড়ে—ট্রুথ জেনারেলি লাইজ ইন দ্য কোঅর্ডিনেশন অফ এ্যান্টাগনিস্টিক ওপিনিয়নস্। কথাটা কি মিনুকে বোঝানো যাবে? যাবে না বলেই মনে হলো। মিনু বুঝলেও কোনো লাভ নেই। যারা বুঝলে লাভ হতো সেই সব ক্ষমতার কর্ণধাররা—তারাই কখনো বোঝেনি। বুঝতে চায়নি। বুঝলে আর যাই হোক, এত যুদ্ধ, এত হত্যা, রক্তের অন্তহীন প্রপাত, ছিন্নমূল মানুষের উদভ্রান্তি অপচয় অপমৃত্যু—এ সমস্তই ইতিহাসের পাতা কলঙ্কিত করতে পারত না। মানুষের ইতিহাসই হতো অন্যরকম। ইতিহাস—এ প্যাক অব্ ট্রিকস্—নাথিং আদার দ্যান এ পিকচার অব ক্রাইমস এ্যাণ্ড মিসফরচ্যুনস্! (ভলতেয়ার, আপনি

ভাগ্যবান, আপনার সময়ে প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশনস্ সেলর এ্যাক্ট ছিল না।)

কাওয়ার্ড! তা মিনু আমাকে কাওয়ার্ড বলতে পারে। এত বছরের ঘনিষ্ঠতা, ভালোবাসাবাসি সত্ত্বেও আমি একদিনও ওকে বিছানায় নিতে পারিনি, সাহসই পাইনি যখন, আমি নিশ্চয় কাওয়ার্ড। আমি খুব বীর, সাহসী—এমন অহঙ্কার নিজেই কখনো করি না। কিন্তু ট্রেটর!—শব্দটার মানে কি? শব্দটার কি নিজস্ব কোনো অর্থ আছে? কোনো চরিত্র? শব্দটা পেট্রিয়টের বিপরীত—এ্যান্টনিম? তাহলে আজকের পেট্রিয়ট কাল কি করে ট্রেটর হয়ে যায় এ্যাণ্ড ভাইস ভার্সা? ট্রটস্কি, লুমুম্বা, ডিমিট্রভ, সুভাষ বোস—এঁদের প্রত্যেকের জীবন তো তারই সাক্ষ্য!

উত্তেজিত, আবেগ-বিক্ষুব্ধ মিনুকে আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, মুক্তি-যুদ্ধ-স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যৌনতাড়নার মতন কোনো সহজ কেমিস্ট্রি নয়। একটু ভাবতেই মনে হলো, আসলে তাবৎ মানুষের কাছে ব্যাপারটা তাই-ই,—এক ধরনের যৌনযুদ্ধ। এ ডিফারেন্ট ফরম অব মাস ইন্টারকোর্স এ্যাণ্ড অর্গাজম! শুধু কেবল মানুষের লিবিডোর সলতেয় আগুন লাগানোর কৌশলটুকু জানা দরকার। তাহলেই মানুষ ভিড় করবে একবার ব্রুটাসের পেছনে, পরমুহূর্তেই এ্যান্টনিওর পেছনে।

সেদিন আমি কেবল মিনুকে বলতে পেরেছিলাম, মিনু, আমার চাকরি গেছে দেশদ্রোহী বলে। শুনছি অ্যারেস্টও করবে। তুমি বলছো, আমি দেশপ্রেমিক নই। তাহলে আমি কী, বলে দেবে? বলো, আমি কী?

মিনু বলেনি। কেউই বলেনি আমি কী! আমি নিজেও জানি না। কিন্তু বছর না-ঘুরতেই—বাহাত্তরে—আমি কেউকেটা হয়ে উঠলাম একজন। খোয়ানো চাকরি আমাকে ডেকে দেওয়া হলো প্রমোশন সহ। সরকারি বেসরকারি নানা মহল থেকে দাওয়াত আসে। সমীহ সম্মানের ভুড়ভুড়ির মধ্যে আমার নিজেকে আবার অচেনা লাগে। বারবার মনে পড়ে, কাফকার 'মেটামরফসিস'। চারিদিকে তার প্রবল হুড়োহুড়ি তখন। সবাই মাস-অর্গাজমের স্বাদ পাওয়ার জন্য অস্থির।

অর্গাজমের পরেই অনিবার্য ক্লান্তি, ঘাম। তারপর আবার নতুন উত্তেজনার অনুসন্ধান। ইতিহাসের ট্রিকস্ শুরু হলো ফের। ক্রাইমস এ্যাণ্ড মিসফরচ্যুনস হয়ে উঠলো প্রাত্যহিক রোজনামচা। অন্য নামে, অন্য স্লোগানে।

মিন্নু বললো, বাবা বলছিলেন, তুমি নাকি এ্যান্টি-গভর্নমেন্ট কীসব লিখছ ?

মিন্নুর বাবা সরকারের একজন হোমড়াচোমড়া। প্রেসিডেন্টের বিশেষ ঘনিষ্ঠ।

আমি নিশ্চিত বার্তা পেয়ে গেলাম, হাসলাম মনে মনে। বললাম, এ্যান্টি গভর্নমেন্ট কিছু লিখিনি। গভর্নমেন্টের এ্যান্টিহিউম্যান কাজের সম্পর্কে লিখেছি। তুমি তো জানো, আমি গভর্নমেন্টের এ্যান্টিও নই, প্রো-ও নই !

কদিন পরেই সম্পাদকের দপ্তর থেকে আমার দু'টো প্রবন্ধ ফেরৎ এলো। সঙ্গে সম্পাদকের সস্নেহ চিরকুট—'কনস্ট্রাকটিভ লাইনে রি-রাইট করো'। আমি লিখিনি।

আমি লিখে খাই। লেখাটাই আমার পেশা। আমার পেশাগত যোগ্যতা সম্পর্কে আমি অভিমানী। যে-কোনো পেশাদার শিল্পীর যেমন হওয়া উচিত।

জামান সাহেব ডেকে বললেন, মান্না, সময় অন্যরকম। একটু সমঝে লেখো।

কী সমঝাবো ? সময়ের রং আমি চিনি না। আমি চিনি মানুষ। মানুষের সম্মান, মর্যাদা, মূল্য, অধিকার বোঝার চেয়ে বেশি কিছু বা অন্য কিছু বোঝার কোনো উৎসাহ আমার নেই।

বললাম, আপনি জানেন, আমি কখনো শ্লোগান মুখস্থ করিনি। শ্লোগান আমি বুঝি না।

চুয়াত্তরের নভেম্বরে চাকরি গেলো। আগেই যাওয়া উচিত ছিল। স্নেহপ্রবণ জামান সাহেব সব রকম চেষ্টা করেও হাল ছাড়লেন। আমি ফের দেশদ্রোহী হয়ে গেলাম।

খবরটা দিয়ে মিন্নুকে বললাম, এবার কী বলবে মিন্নু ? বলো এবার, আমি কী—বলো—

সিপাইর পিছুপিছু জেলারের ঘরে এসে দাঁড়ালো মান্না। এ-ঘরে আরো অনেকবারই এসেছে। জেলার সাহেবের মাথার ওপরে গোল ঘড়ি। তার ওপর নতুন প্রেসিডেন্টের সরীসৃপ-হাসি-মাখা ছবি। টেবিলে অনেক ফাইল কাগজপত্র। ঠিক প্রথম দিন যেমন দেখেছিল। ঐসব ফাইল কাগজপত্রে

যেন যাবজ্জীবনের দণ্ডাদেশে এখানে জমায়েত হয়েছে। টেবিলের ঐ জঞ্জাল একদিনও কমতে দেখেনি মান্না।

টেবিলের ওপরে বাঁ দিকে জলের গ্লাস। ডানদিকে কাগজপত্রের ভিড়ের মধ্যে চামড়ার খাপে ঢাকা রিভলভার শোয়ানো।

মান্না আসতেই জেলার সাহেব ভারি শরীরটা সোজা করে রংপুর-থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত লম্বা হাসি মুখে করে বললেন, আসুন, মান্না সাহেব। সুখবর শুনেছেন নিশ্চয়। আপনাকে আজই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ইউ আর ফ্রী নাউ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মান্না। কথাগুলো শুনলো কিনা বোঝা গেলো না। মুখের একটা রেখাও নড়লো না। ওর চোখ প্রেসিডেন্টের ছবি আর ঘড়িটার মধ্যবর্তী ফাঁকা দেয়ালে। একটা টিকটিকি কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রয়েছে। চিবুকটা টান করে তোলা, লেজটা ঘড়ির আড়ালে বাঁকানো।

জেলার সাহেব আর একটু জোরে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তখনই বলেছিলাম ইট ওয়াজ এ মিস্‌টেক!

—মিস্‌টেক! শব্দটা মান্নার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আলগাভাবে গলে এলো। মুখের মধ্যে যেন সীসার টুকরো ছিল। সেটাই উগরে দিলো। কিন্তু একটা কটু বিস্বাদ জিভ থেকে মগজের মধ্যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে।

জেলার সাহেব উৎসুকভাবে মান্নার মুখের রেখা ও চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না। মান্নার মুখ ভাবলেশহীন। তিনি আহ্লাদী হাসি ছড়াতে ছড়াতে বলেন, হ্যাঁ। সত্যিই, ওটা একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি খুবই দুঃখিত মান্নাসাহেব! আপনার মতো মানুষকে এভাবে—যাকগে, পুরনো কথা বাদ দিন। ভুলে যান সেসব। আজ আপনি ফ্রী!

—মিসটেক। দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে মান্না। চকোলেটের মতন শব্দটা মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। মিসটেক—ভুল—এ সিম্পল রিয়েল ভুল।

শুধু ভুলবশতই একজন মানুষকে ৮।৯ মাস জেলে আটকে রাখা চলে, বিনা বিচারে, বিনা চার্জে। এবং আটক থাকা কালে কোনো আপীল চলে না। হেভিয়াস কর্পাসের দোহাইও পাড়া যায় না! কার ভুল, কেন ভুল, কেন এই একজন বিশেষ মানুষকে নিয়েই ভুল—এসব প্রশ্নের জবাবও কেউ দেবে না। অথচ এটা একটা স্বাধীন দেশ। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে

অর্জিত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার মধ্যে শুধু ভুলবশতই একজন নিরপরাধ মানুষ মাসের পর মাস জেলবন্দী থাকতে পারে! স্বাধীনতা বস্তুটা তাহলে কী ?

মান্নার চোয়ালটা শক্ত হয়, ভারি হয়ে ঝুলে পড়ে। ও বলে, শুধু শুধু এতগুলো মাস—

জেলার সাহেব তৎপরতার সঙ্গে কথাটা লুফে নিয়ে হ্যা হ্যা করতে করতে বলেন, এই তো কটা মাস—সামান্যই—

সামান্য! ৮।৯ মাস সামান্য সময়! শব্দ দুটো নিয়ে নিজের মনে লোফা-লুফি খেলে মান্না। এই যে এতগুলো মাস—রাত—দিন আমি খোলা আকাশ দেখিনি, কৃষ্ণচূড়ার নাচ দেখিনি, গড়ের ময়দানে সবুজ ঘাস দেখিনি, সদর ঘাটের নদী, লঞ্চ, ভিড় কিছুই দেখিনি—এ সবই সামান্য ? আমি কত কী করতে পারতাম এই ক'মাসে—পড়াশোনা, লেখালেখি—কিছুই করা হয়নি। মিনুর সঙ্গে অনেক রমণীয় সন্ধ্যা কাটাতে পারতাম। কিংবা—কিংবা সেলের বুকচাপা অন্ধকারে আমি পাগল হয়ে যেতে পারতাম। এবং কে জানে, হয়তো—হয়তো—কোনো দুর্বল মুহূর্তে নিজেকে ধ্বংসও করে ফেলতে পারতাম! অথচ এই লোকটা বলছে, সামান্য সময়—ভুল। ভুল—সামান্য সময়! একটা ছোট ছেলে শ্লেটে অংকটা ভুল করেছে, মুছে আবার করলেই হলো—ব্যাপারটা যেন এর বেশি গুরুতর কিছু নয়! মান্নার চোখের কোণে জ্বালাভাব।

খুব ঠাণ্ডা গলায় মান্না বললো, আপনারা কি স্থির করলেন—আমি কী ? ট্রেটর—

ভর গালে ভাঁজ ফেলে জেলার সাহেব ঘন ঘন মাথা ঝাঁকান। চকিতের জন্য মান্নার মনে হয়, লোকটা একটা আস্ত হনুমান। দাঁত বের করে বললেন—নাথিং। কিচ্ছু না—

জেলার সাহেব এর পর আরো কিছু বলেন। কিন্তু মান্না সেসব শুনতে পায় না। 'কিচ্ছু না' এই ছোট্টো শব্দতরঙ্গ এক প্রবল ধাক্কায় ওকে মাধ্যাকর্ষণের সীমার বাইরে ছুঁড়ে ফেললো। কিচ্ছু না—আমি কিচ্ছু না—নাথিং—আই অ্যাম নাথিং—নোবডি—আমি একটা অনস্তিত্ব—আমি একেবারে কি-চ্-ছু-না—এই বোধ এবং অন্য কোনো বোধহীনতা মান্নার সামগ্রিক অনুভবের মধ্যে আলোড়িত হতে থাকে। ও যেন এক অন্তহীন তলহীন মহাশূন্যতার মধ্যে দুলছে—ছুটছে

—ঘুরছে ; কিন্তু দুলছে না—ছুটছে না—ঘুরছে না। মান্নার চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো, কিছু না তো আমি কী—আমি কী ? আমি তাহলে জেলে কেন ? আমার কেন চাকরি নেই ? আমার কেন মিনু নেই ?

মান্না কিন্তু চিৎকার করলো না। করতে পারলো না। কোনো কথা বললো না। বলতে পারলো না। মাথার মধ্যে একটা কম্পিউটার মিনিটে হাজার লাইন স্পীডে ছেপে যেতে লাগলো—আমি কিচ্ছু না—আমি কিচ্ছু না—আমি কিচ্ছু না—

হঠাৎ ওর গলার শিরা সজিনের মতন টানটান হলো। অসম্ভব শব্দে হেসে উঠলো মান্না। প্রেসিডেন্টের ছবিটা একদিকে বেঁকে গেলো। টিকটিকিটা সরে গেলো ঘড়ির নিরাপদ আড়ালে।

বোকা-বোকা, প্রায় হতভম্ব, চোখে জেলার সাহেব তাকালেন ওর দিকে। বাইরে থেকে দুজন সিপাই ছুটে এলো।

ঠিক তখন, একেবারে আচমকা, নিজেও সচেতন ভাবে বুঝে ওঠার আগে, মান্নার ডান হাত সজোরে বসে গেল জেলার সাহেবের গালে। টায়ার ফাটার মতন চড়াৎ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে জেলার সাহেব চেয়ার সুদ্ধ হেলে পড়লেন ডান দিকে। টেবিলের কাগজপত্র এলোমেলো হলো। জলের গ্লাস মেঝেয় পড়ে ভাঙলো। সতর্ক সিপাই দুটো মান্নার দিকে ছুটে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। টেবিলে-শোয়ানো রিভলভার মান্নার হাতে।

জেলার সাহেব নিজেকে সামলে চেয়ারে সোজা হয়ে বসেন। ডান হাত বাঁ গালে ঘষেন। স্কুল ছাড়ার পর চড় খাওয়ার স্বাদ ভুলে গিয়েছিলেন। অনভ্যাসে ভীষণই লেগেছে। এক পলক মান্নার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ-মুখের রেখা পড়ার চেষ্টা করলেন। তারপর অভিজ্ঞ চোখ মান্নার রিভলভার-ধরা হাতের উপর স্থির রেখে ভরা গালে ম্লান হাসির আঁচড় কেটে বললেন, এটা কী হলো মান্নাসাহেব ?

—মিস্‌টেক—জাস্ট এ মিসটেক! মান্না হেসে হেসে বললো—আই এ্যাম সরি। আমি খুব দুঃখিত !

ইচ্ছাকৃতভাবে মুখটা করুণ করে জেলার সাহেব বললেন, রাগটা আমার মত সামান্য কর্মচারীর ওপরই ঝাড়লেন ! আপনি তো জানেন, আমরা হুকুমের চাকর মাত্র !

—থাক্‌গে। জোরে শ্বাস টেনে ফের হাসি-হাসি মুখ করে সামনের দিকে

ঝুঁকে হাত বাড়ালেন জেলার সাহেব—ওটা দিন—রিভলভারটা—

—নো! এক পা পিছিয়ে চিৎকার করে উঠলো মান্না।—এটাই তো ডিসাইড করে কে কী! এখন এটা আমার হাতে। আমাকে জানতে হবে, আমি কী—আই মাস্ট নো হোয়াট্ আই এ্যাম! আই মাস্ট নো—আমাকে জানতে হবে—

ট্রেটর, পেট্রিয়ট—এসব শব্দগুলো নেহাতই বাজে, অর্থহীন। যখন যার হাতে রিভলভার সেই-ই পেট্রিয়ট—তার বিরোধীমাত্রই ট্রেটর। কিন্তু মান্নার তাতে কিছু যায়-আসে না। তার তাতে কোনো আগ্রহ, কোনো কৌতূহল নেই। যে যা খুশি হোক।

ও চিৎকার করে, আমাকে জানতেই হবে আমি কী—আই মাস্ট নো হোয়াট আই এ্যাম—আই মাস্ট—

জেলার সাহেবের ইঙ্গিত চোখে পড়ে না মান্নার। এক ঝাঁক বেয়নেট নিপুণ লক্ষ্যে ঝাঁপ দেয়।

মান্না জানত না একজন মানুষের জন্য এত অসংখ্য পুলিশ ও এত অজস্র অস্ত্র ক্ষুধার্ত প্রতীক্ষায় থাকে।

পিঁপড়ের পদশব্দ

মাত্র পাঁচ মিনিটের পদচালনা, বিপুল পদচালনাই বলে, হাঁটা শব্দটার মেঠোগন্ধ নাগরিক বিপুলের না-পসন্দ ; তবু, তাইতেই বগল ভিজে, কলার সোঁদা। কলকাতায় হেমন্ত নেই, জানা ছিল। তাবলে বসন্তও থাকবে না! ফাল্গুনের সকাল দশটায় রাস্তায় দাহজনিত ধোঁয়া যার-পর-নেই কুৎসিত।

আধখানা সিগারেট ছুঁড়ে দেবার দ্বিধাবিভক্তি নিয়ে বিপুল দেখে, স্পেশাল বাসটি গাঁ গাঁ শব্দে গোগ্রাসে ধোঁয়া গিলতে-গিলতে আসছে। ও বিখ্যাত বাঘের মতন তৎপর হয়। অনিচ্ছুক হাত থেকে সিগারেটের উৎক্ষেপন, বাঞ্ছিত হ্যাণ্ডেলটির জন্য ওর আত্যন্তিক প্রচেষ্টা এবং আঙুলের উদগ্রীব ডগা মিহিভাবে ছুঁয়ে বাসের দরজার সশব্দ বন্ধ হওয়া ও নিমেষে নাগাল-হারা হওয়া এমনভাবে ঘটে যে, তার পরম্পরা নির্ধারণ করার মতন দুরূহ পণ্ডশ্রম ঐ মুহূর্তে পৃথিবীতে আর কিছু থাকে না। বিপুলের মগজে অজস্র চকমকির ঠোকাঠুকি হয়। অশ্লীল শব্দমালা, সাতাশ বছরে যত আহরণ করেছিল, অটোমেটিক, নিরুচ্চার শব্দহীনতায় মাথার মধ্যে মিছিল করে ছুটে যায়। নিজেকে আরো একবার, আনকোরা, পরাজিত মানুষ মনে হয়। নীল রুমালে ঘাড় গলা মুছে বিপুল সরলভাবে বলে, 'আমি শালা এক নম্বরের ভোদাই!'

সকালে বাজারে গিয়েই মনে হয়েছিল, সময়টা খারাপ। মানে, কুটিল। চিংড়ির—তেমন বড় ছিল না মোটেই—দাম জিজ্ঞেস করতেই, 'আপনি নিতে পারবেন না—' কৃষ্ণনগরের মেছো পুতুলের নিভুর্ল মডেলটি ভুঁড়ি কাঁপিয়ে, রক্ত-লাল দাঁতের ধমক দিয়ে বলেছিল, '—বাবু।' 'বাবু' শব্দটিতেই ছিল সেই বিষ, যা কেউটের মধ্যে আরোপিত। কেউটে থেকেই কুটিল কথাটি মনে আসে। এখন বাসহারা, দাহ্যমান রাস্তায় অসহায় বিপুলের আবার মনে হয়, সময় কুটিল। পিঁপড়ে কামড়ালেও কেউটের বিষ লাগছে। সকালের

মাছঅলা, বিশেষ বর্জিত বাসড্রাইভার-কণ্ডাক্টর পিঁপড়ের চেয়ে বেশি কি ; কি ?

পরবর্তী আধঘন্টায় বিপুল সার্কাসের জোকারের মতন বহুবিধ কলাকৌশল প্রদর্শন করে। বলা-বাহুল্য, ব্যর্থ হবার জন্যই। বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি—যা-হোক কোনো বাহন লাভের চেষ্টার ফলাফল শূন্যর বেশি হলো না কিছুতেই। এত কম মার্কস, বিষয়ের পর বিষয়ে, জীবনে কখনো পায়নি। ক্রমশ দ্বিতীয় রিপুর নিরীহ শিকার হয়ে বিপুল প্রকৃত অর্থে পর্যুদস্ত ও বিপন্ন বোধ করে। শেষ ট্যাক্সিটি—খালি—'উধার নহি যায়েগা' বলে পাঞ্জাব-কেশরীর বীরত্বব্যঞ্জক ঝাণ্ডা তুলে চলে যেতেই বিপুলের মগজে দাঁত কামড়ায়। বিষ। হাতের আঙুলগুলো যে-কোনো একটি নরম গলা খোঁজে, টিপ-ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য। তেমন বাধ্য গলা পৃথিবীতে অবশ্যই নেই।

বিপুল পরিষ্কার দেখতে পায়, ম্যাথুজ সাহেব ইতিমধ্যেই অন্তত পাঁচবার খবর নিয়েছেন, গ্যাংলি এসেছে কিনা। (শালা বরাহসন্তান, এমনভাবে গাঙ্গুলির বদলে গ্যাংলি উচ্চারণ করে যে ইচ্ছে হয়, আটচল্লিশ ইঞ্চি পাছায় ক্যাঁত-ক্যাঁত করে সতেরোটি লাথি ঝাড়ে, গুনে গুনে। সতেরোর একটাও কম নয়।) এখন অফিসে গেলেই, যদি যেতে পারে—কখন যাবে সেতো ভগার ঠিকুজিতে লেখা—আখাম্বা চুরুট চিবিয়ে কুড়ি মিনিট এমন লেকচার দেবে, যার তুলনায় দুটি-একটি কানমলাও সুখদ। এককালের ট্রেড-ইউ নেতা, মহাবিপ্লবী পদকুট্টি টমাস ম্যাথুজ এখন সার্থক পাঁচ হাজারী মনসবদার। দুই ভূমিকার একটি মিল কিন্তু অটুট। তখনো কাগজে ছবি বেরুতো, এখনো বেরোয়। কেবল পাতার নম্বরে যা বদল।

এক সময়ে, যখন এক ঘন্টা লাগিয়ে দাড়ি কামাতে রমণীয় আনন্দ পেতো, বিপুলেরও বিপ্লবের প্রতি মার্-মার আসক্তি ছিল, যেমন ছিল যে-কোনো তরুণীর কল্পিত প্রেমের প্রতি। তখন নেতাদের সামনে থেকে দেখাই ছিল নিয়ম ও সম্ভব। পাকানো মুষ্টি, কণ্ঠস্বরে বহ্নিস্রাব। মনে হতো, নেতা তক্ষুনি পকেট থেকে পোষা বিপ্লব বের করে দেখাবেন। হঠাৎ, আচমকা, একদিন নেতাকে পেছন থেকে দেখতে পায় বিপুল। কোঁচা খিমচে শাদা গাড়িতে উঠছেন, মসৃণ পাম্প-শুর কুমারী হাঁ-র ওপরে চমকে উঠেছিল ননীনির্মিত পায়ের অংশ—কী পেলব ! পাও যে দ্যুতিময় হয়, জেনেছিল সেদিন। এবং কেন, কে জানে, বুঝেছিল, ও-পা বিপ্লবীর নয় ; লং-মার্চ কিছুতেই পারবে না। পরে ঐ নেতারই ব্যগ্র বাহুবন্ধনে উদীয়মান, শকুন্তলাস্বরূপিনী, সুখ-

নেত্রীকে দেখেও 'ইউরেকা! ভদ্রবতা, তোমারই নাম বিপ্লব' না বলে কেবল ভেবেছিল, 'ও-ও, এই-ই তবে!' কেন ভেবেছিল তার কোনো ব্যাখ্যা অবশ্য বিপুল দিতে পারবে না। খুব সরল বিষয়ের কি ব্যাখ্যা হয়!

এখন অবশ্য মাঝেমাঝেই ম্যাথুজের গুহ্যদেশে কালিপটকা গুঁজে পলতের আগুন দিতে ইচ্ছে করে, বিপ্লবের রূপ সঠিক জানার বৈজ্ঞানিক এষণা থেকে। এষণা? হাঃ—হাঃ!

পুঁইশাক আর আলুপোস্তর গন্ধমাখা দীর্ঘশ্বাসটা মোচন করতে পারার আগেই, 'মিঃ গাঙ্গুলি!' শুনে বেমালুম ত—থ—দ—ধ বনে যায় বিপুল। এমন সমীহ-নরম স্বরে কে ডাকবে ওকে? মানুষের যে দুই-একটি স্বভাব-গুণ এখনো নিটুট বলে বিপুল মোটামুটি টিঁকে আছে আজও, তার মধ্যে ঘাড় ঘোরাতে পারা—সুযোগ ও সুবিধের সদ্ব্যবহারকল্পে—নিঃসন্দেহে প্রধান। এই মুহূর্তেও, বিনা ভুলে, অবলীলায় ঘোরালো।

শাদা অ্যাম্বাসেডার, শাদা য়ুনিফর্মসজ্জিত ড্রাইভার, জানালায় পতাকার মতন হাত বা মুখ, বা লেমন-অরেঞ্জ মার্কিনী কলার—এর কোনটা প্রথম বিপুলের দৃষ্টি টানে, বলা অসম্ভব। অপিচ, একটি সুচারু ফুলেল-মুখের অনুনয় জড়িত হাসি-ভঙ্গিমার অর্ঘটুকু যে ওরই উদ্দেশে নিবেদিত এটা বিপুল নিখুঁত বোঝে। কিন্তু, কে এই দেবদূত?

—'আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি ভূপেন হালদার। অফিসে যাবেন তো, উঠে আসুন গাড়িতে—

যেন এই গাড়িতে ওঠার আহ্বান ওর অনিবার্য প্রাপ্য,—এমন ভঙ্গিতে ঈষৎ ভারি মুখ করে উঠলো বিপুল। শরীরটাকে আরামপ্রদ স্বাচ্ছন্দ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, 'চিনেছি ঠিকই। তবে প্রতিদিন এত লোকের সঙ্গে—প্রথমটায় একটুখানি—'

বিপুল অভিজ্ঞতায় শিখেছে, এসবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্য অপ্রয়োজনীয়। ভূপেন হালদার বার কয়েক এসেছে ওর কাছে। বিপুলের হাতের কলমই হালদার মশাইর লক্ষ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির জন্য দায়ী। ওর কলমের একদিনের ক্লান্তি, একটি অটোগ্রাফ দিতে না-পারার মতন চকিত বিস্মরণও, লোকটির হৃদরোগ ঘটাতে পারে।

হালদার-প্রদত্ত ইণ্ডিয়া কিং তারই বাড়ানো রনসনে ধরাতে গিয়ে আমূল কেঁপে ওঠে বিপুল। শালা! আমার সইয়ের বিনিময়ে তোমার গাড়ি, রনসন,

ইণ্ডিয়া কিং এবং নিশ্চয় বাড়ি বা বিশাল ফ্ল্যাট। অথচ সইদার বিপুল গাঙ্গুলি একজন হরিদাস পাল—সর্বতোঅর্থে স-বহারা। বিপুলের মগজে দাঁতকামড়। বিষ। রাস্তায় ধোঁয়া। সিগারেটে ধোঁয়া। বিপুলের চোখ জলে। জলন্ত চোখে বিপুল সঠিক নিরুপণ করে, ভুপেনের গলা তেমন মোটা নয়। দু'হাতে ধরে যাবে? একটু জোরে চাপ দিলে কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। পেছন থেকে ড্রাইভারকে সামলাতে কিছুই অসুবিধে হবে না—এটুকু আত্মবিশ্বাসের অভাব এখনো ঘটেনি। খুব সরলভাবেই গাড়িটা বিপুলের হতে পারে। ভুপেনের পকেটে বা ব্রীফকেসে কয়েক হাজার থাকাও স্বাভাবিক। লাখ-লাখের বদলে এতো নস্যি। অবশ্য রিভলবার হলে আরো সহজেই ব্যাপারটা সমাধা করা যায়। ম্যাথুজের সঙ্গে গিয়ে আদক অ্যাণ্ড সন্সে বন্দুক-রিভলবার দেখেছে বিপুল। হাতে নেয়নি। হাতে উঠে এলে কি পারবে না?

অফিসের সামনে নেমে দাঁড়িয়ে বিপুল দুরতিক্রম্য অনিবার্য কবন্ধটির সম্মুখীন হয়—লোডশেডিং। সাত তলা ওকে হাঁটু ভেঙে উঠতে হবে! হাঁটু ভেঙে সাততলা? এই গরমে। বিপুলের মনে হয়, শিরায় ধমনীতে রক্তের বদলে লাল পিঁপড়ে হাঁটছে। ওর অনুভবে বাজে, রক্তের গমনধ্বনি নয়—পিঁপড়ের পদধ্বনি।

প্যান্টের পকেটে হাত রেখে, অ্যাট-ইজ দাঁড়িয়েছিল বিপুল। ভাবলো, রিভলবারে হবে না। গ্রেনেড দরকার। খুব ধীরে ধীরে পকেট থেকে হাত বের করলো। কিছুই উঠে এলো না। ইণ্ডিয়া-কিংয়ের দেহাবশেষ পদদলিত করে কদম-কদম এগিয়ে চললো।

হৃৎপিণ্ড মুখে করে নিজের ছোট্ট চেম্বারে ঢুকতেই বিপুলের একটুখানি হাসি পায়। এভাবে উঠতে পারলে এভারেস্ট খুব উঁচু নয়। পারবে না? চেয়ারে বসে বুঝলো, হাঁটু-কোমর ব্যথায় একাকার। টেবিলে-রাখা জলের গ্লাস নিমেষে শূন্য। আঃ!

এখুনি বোধ হয় পদকুটি ম্যাথুজের সামনে হাঁটুভেঙে দাঁড়াতে হবে। বিপুল নিজেকে প্রস্তুত করতে পারার আগেই সুইং-ডোরে, অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হয় প্রমীলা চ্যাটার্জি। বম্বের মহানায়িকাও এভাবে দাঁড়াতে জানে না। আর, স্ট্রীপ না-করে নিখুঁত শরীর প্রদর্শন কীভাবে করতে হয়, সে-বিষয়ে প্রমীলা 'লিডো'-র শ্রেষ্ঠ শিল্পীকেও শিক্ষা দিতে পারে।

—'আহ! এতক্ষণে ভোর হলো'।

পেটেন্ট ভ্রু-ভঙ্গি ও স্তনকম্পন—যা অব্যর্থভাবে বিপুলকে প্রতিবার, ট্রেগারের হুকুমে বাঘের দাঁড়ানোর মতন, প্রতীক্ষ্য করে—এখনো, শ্রান্ত বিধ্বস্ত বিপুলকে অমোঘভাবে ব্যাকুল ও আর্ত করলো। গলার ভেতরে গরম হাওয়ার চলাচল।

সাবলীল হাসলো প্রমীলা। সারা শরীর ব্যালে ড্যান্সারের মতন কাঁপিয়ে বললো, 'ভোর, আর থাকবে না। এক্ষুনি অন্ধকার নামবে।'

—'নামবে ? উঃ ! কতদিন অপেক্ষায় আছি। বহুদিন হলো—'

আঁচল ঠিক করার অজুহাতে লাল বুক, মোমের পেট দেখিয়া প্রমীলা বললো, 'আপনি পারেনও ! যান, বস ডাকছেন। তিনবার খোঁজ হয়েছে অলরেডি।'

—'তাই নাকি ! তা যুদ্ধযাত্রার পূর্বে ইন্দ্রজিতের ঘামটা অন্তত মুছে দিলে হতো না !'

পীবর নিতম্বের ভাঁজে বিপুলের হৃদ্‌স্পন্দন তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রমীলা ওকে সেই দৃষ্টিকণা দিয়ে যায়, যা ক্ষুধার্ত বাঘকে বিস্কুট ছুঁড়ে দেবার সমতুল্য। বিপুল মগজে দাঁতের রোষ অনুভব করে। বিষ।

ম্যাথুজের স্পেশাল সেক্রেটারি প্রমীলা, বিপুলকে আবদেরে বালগোপাল ছাড়া কিছু মনে করে না। অথচ বিপুল ওরই জন্য এক সাম্রাজ্যসমান প্রেম-বৈরাগ্য পুষে রেখেছে নিজের মধ্যে। সাতাশ বছরের সমস্ত সফলতা, বিফলতা, রাগ, নিষ্ঠুরতা, প্রেম, বীর্য বিপুল এই প্রমীলাকেই দিতে চায়। ধৈর্য ছাড়া।

চৌরঙ্গীতে, নিউ-মার্কেটে, রোজ প্রায়, চমৎকার হৃদয়গ্রাহী সব জিনিষ দেখে বিপুল। শার্ট-প্যান্ট, টিভি-ফ্রিজ, টেপ-স্টিরিও, কুকার-ওয়াশিং মেশিন, নারী-স্তন, বন্দুক—বন্দুক ? হ্যাঁ, বন্দুক !—কত কী। সব কিছুর ওপরই লাগানো অব্যর্থ, নির্ভুল, দাম্ভিক লেবেল—'নট ফর য়ু'—পড়তে কখনো ভুল হয়নি। এ-পৃথিবীর সবকিছুই কেবল নির্বাচিত কয়েকজনের জন্য। বাকি সকলে, জনগণ নামে যারা পরিচিত, তারা কেবল দেখবে, হাত কামড়াবে, আরশোলা সেজে আরশোলার জন্ম দিয়ে যাবে। বিপুল জানে, আরশোলাই একমাত্র প্রাণী যে পৃথিবীর বিবর্তন ধারার ওপর নির্বিকারে কেবল কালো গুটি বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে অবিকল থেকে গেছে ! বিপুল নিজে, তার চেয়ে বেশি কিছু করেছে কি ?

দীর্ঘদিন প্রমীলার শরীরের বিজ্ঞাপিত লেবেলটি ও দেখতে পায়নি।

এখনো পুরস্কৃত ডালিয়াসদৃশ বুকের দিকে তাকালে প্রেমার্ত দৃষ্টিবিভ্রমবশত দেখতে পায় না, কিন্তু ঘুরে দাঁড়ালেই নিতম্বের ওপর নিওন-অক্ষরে লেখা 'নট ফর য়ু' লেবেলটি অনায়াসে, অন্ধচোখেও, পড়তে পারে। আর, তা পারলেই বিপুল নিজের ভেতরে একটা প্রত্যনীক শ্লোগান শুনতে পায়—হাজার হাজার গলা শিরা ফুলিয়ে বলছে, 'নট ফর য়ু'; আর ও একা বলে, 'হোয়াই নট ফর মি'? বিপুল তখন চিৎকার দেবার চেষ্টা করে। সে-চিৎকার নিজের কানেও পৌঁছয় না। চিৎকার সকলে দিতে জানে না।

ম্যাথুজের সামনে পাক্কা আধঘন্টা বসতে হলো। হাঁটু ভেঙেই। ম্যাথুজের মুখে আখাম্বা চুরুট। শালা জানে না, নিজের পুরুষাঙ্গই চিবোচ্ছে। এক-কালের মহান ট্রেড-ইউ বিপ্লবী নেতা পেশাদারী ময়দানী ভঙ্গিতেই বিপুলের আগাপাসতলা ধোলাই করেন। বিপুলের ভুলের জন্যই পার্লামেন্টে কোম্পানী সম্পর্কে তদন্তের কথা উঠেছে। ও চিঁ হিঁ গলায় বলার চেষ্টা করে, কাজ-গুলো তো আপনার নির্দেশ ও অনুমোদন মাফিকই করা হয়েছে। বাট সীজার ক্যান ডু নো রং, মাই ডিয়ার! ভুল তোমারই। তোমার উচিত ছিল বিষয়টার গুরুত্ব বোঝা, সম্ভাব্য বিপদের পয়েন্টগুলো ম্যাথুজের নজরে আনা। আসলে, তুমি বিপুল গ্যাংলি, একটা ইউজলেস নিনকমপুফ। নেহাৎ ম্যাথুজ, আফটার অল, বেসিকেলি, একজন টি-ইউ ম্যান, তাই তোমার চাকরির ক্ষতি করছেন না। কিন্তু মনে রেখো—হি হ্যাজ অলসো লিমিটেশনস্। প্রেসিডেন্ট-প্রাইমমিনিস্টারেরও থাকে। ডোন্ট ফরগেট!

ধোলাই হতে-হতে বিপুল একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত নেয়। খুবই শান্ত ভাবে। ওরে শালা, বিপ্লবীর বাচ্চা! তোমার পকেটে বিপ্লব থাকতো। ময়দানে, মিটিংয়ে বিপ্লব দেখাতে তুমি। ভণ্ডামি! আমিই তোমাকে বিপ্লব দেখাবো, সর্বহারার বিপ্লব। রিভলবার হাতে উঠে এলে, প্রথম বুলেট তোমারই জন্য থাকবে। যেমন, একাগ্নী বাণ।

শিরায়-ধমনীতে পিঁপড়েরা ভীষণ কামড়ায়। মগজে দাঁতের ক্রোধ। বিষ। মাথায় শরীরে। প্যান্টের পকেটে গোঁজা দুই হাতের নোখ খামচে, পকেট ছিঁড়ে, নিজের উরুতে রক্ত ঝরায়। জ্বালা। দাঁতের ওপরে দাঁত।

একটু পরে, আরেকবার আনকোরা হেরো মানুষ, ভগ্নহাঁটু বিপুল ছেঁড়া পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে নিজের চেম্বারে ফেরে।

পকেট হাতড়িয়ে কী লাভ? হাতে কিছুই উঠে আসে না। না গ্রেনেড,

না বোমা, রিভলবার দূরে থাক একটা সেফটি-ব্লেডও কি থাকতে নেই! করতলগত হবে বলে কিছু আর বাকি নেই। বরং হাত দুটোই কোথাও লুকিয়ে রাখা ভীষণ জরুরী। যে-হাত ফ্রিজ-স্টিরিও, টেপ-টিভি, কুকার গাড়ি, প্রমীলা—স্তন, স্তন? প্রমীলার? হ্যাঁ, প্রমীলারই—, ওয়াশিং-মেশিন—এমনকি বাসের হ্যাণ্ডেলও ধরতে পারে না, বা সঠিক বলা উচিত, যে-হাতের ছোঁয়া পেয়ে স্পেশাল বাসের দরজা গর্জন করে বন্ধ হয়ে যায়, সে-হাত কেন রাখা! কেন?

পিঁপড়ের পদধ্বনি শুনতে-শুনতে ত্রস্ত বিপুল দু'হাত লুকোবার জন্য জায়গা খোঁজে। আপাতত।